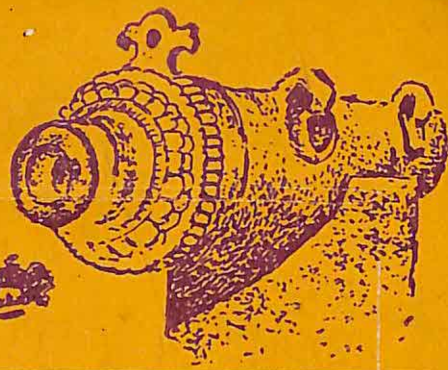
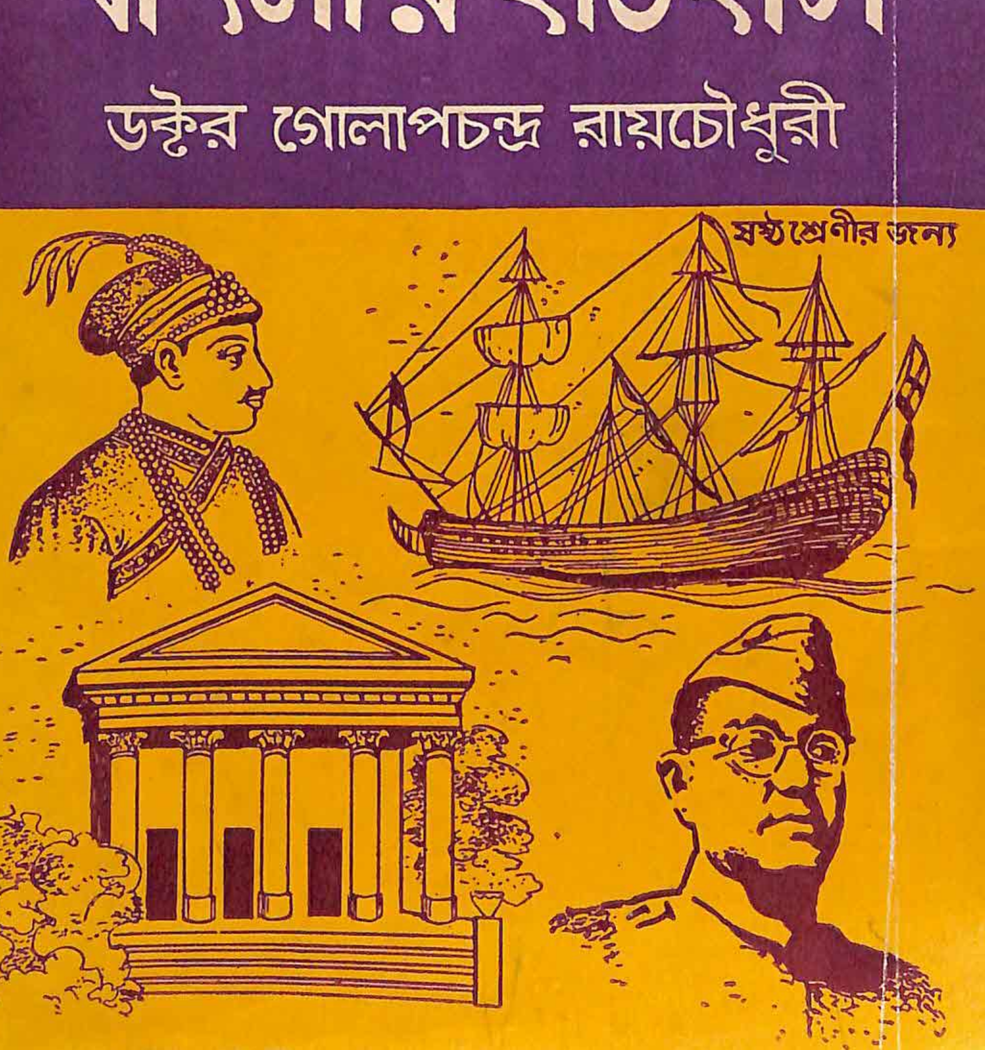




বাংলার ইতিহাস

ডক্টর গোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী

ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য



পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত ইতিহাসের
নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য লিখিত

বাংলার ইতিহাস

প্রথম ভাগ

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

ডক্টর গোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম. এ., পি-এইচ. ডি. (লণ্ডন)
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন অধ্যাপক, এলমায়রা কলেজ, নিউইয়র্ক
অষ্টিন কলেজ, শেরম্যান, টেক্সাস, আমেরিকা

দি ম্যাকমিলান কোম্পানি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড
২৯৪, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
১৯৭৪

THE MACMILLAN COMPANY OF INDIA LIMITED
DELHI MADRAS BOMBAY CALCUTTA
Associate companies throughout the world

First Edition 1974

Made in India
Printed by I. B. Lahiri at Homin Art Press
52/9 Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12 and
Published by. U. N. Banerjee for The Macmillan Co. of India Ltd.
294, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

গ্রন্থকারের নিবেদন

এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকটি মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ প্রবর্তিত ইতিহাসের নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত হয়েছে। প্রাচান যুগের বাংলার ইতিহাস খুব স্পষ্টভাবে জানা যায় না। ঘটনার পারম্পর্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ইতিহাস পাঠে আনন্দ পায়, সেজন্য সন তারিখের জটিলতা যথাসম্ভব বর্জন করে বইটি গল্পের আকারে লেখা হয়েছে।

ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা যাতে অপরের সাহায্য ছাড়া নিজেরাই বাঙালীর গৌরবের ইতিহাস জানতে পারে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয় সেজন্য যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য করে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। পুস্তকের শেষে যে সকল অনুশীলনী দেওয়া হয়েছে, আশা করি সেগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিহাস পাঠে আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করবে। এ বিষয় কতদূর কৃতকার্য হয়েছি তা সহৃদয় শিক্ষকসমাজ বিচার করবেন। এই পুস্তকের মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তাঁদের অমূল্য উপদেশ গ্রহণের জন্য সাগ্রহ অপেক্ষায় রইলাম।

১ জানুয়ারী, ১৯৭৪ — শ্রীগোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী

SYLLABUS IN HISTORY

For Class VI

History of Bengal

Geographical boundaries of Bengal

A. (i) Bengal in ancient times (References in the Vedas and the Epics, in Jaina, Buddhist literature, from the invasion of Alexander to the rise of the Guptas 326 B.C.—320 A.D. (Bare outlines)

(ii) Sasanka of Gauda (606-637 A.D.)—Career, Religion, extent of his kingdom.

(iii) The Palas—Election of Gopala, Dharmapala, Devapala (750 A.D.-850 A.D.) Civilisation & Culture in the Pala Period (Sanskrit literature, Buddhist Scholarship. Vernacular literature, Charyyapada & Vaishnava Poems; Universities—Uddandapura and Vikramsila, Patronization of Nalanda University; art and architecture) Silabhadra, Atisa or Dipankara Sirjanan, Pandit Dharmapala.

(iv) Decline of Pala Power; Kaivarta Revolt, Rampala and the revival of the Pala—his conquest & career. Literature—Ramcharita of Sandhyakara Nandi, Chakrapani Dutta (Medical treatise).

(v) The Senas—Bijaya Sena, Ballala Sena, Lakshmana Sena, Literary works, revival of Brahmanism in Bengal, Social reforms.

B. (i) Conquest of Nadiya, Capital of Lakshmana Sena, Ikhtiyar Uddin Muhammad-bin-Bakhtiyar Khalji (1205 A.D.),

(ii) Rulers of Bengal: Ghiyas-ud-din Azam, Raja Ganes, Husain Shah, Nusrat Shah, Iliyas Shah. Literary works: Religious toleration, Social and Religious Reforms —Sri Chaitanaya—Spread of Vaishnavism.

(iii) Bengal's resistance against the Mughals. Isakhan, Kedar Roy and Pratapaditya.

C. (i) Mughal Rule in Bengal : (outline only) Murshid Kuli Khan, Sujauddowla, Sharfraj, Alivardi, Sirajauddowla, Bargir depredations,

(ii) (a) Advent of Europeans, Principal Trade Settlements, Conflict with the English—Plassey. (b) Growth of English Power in Bengal—Clive, Mirzafar, Mir Kasem, Grant of Diwani, the Famine (1770), Permanent Settlement.

D. Renaissance in Bengal : Rammohan Roy, Debendranath Tagore, Iswar Chandra Vidyasagar, Rajnarayan Basu, Kesab Chandra Sen, Sri Ram Krishna Deva, Bankim Chandra (Bare outline)

E. Bengal Partition (1905) : Swadeshi Movement and its leaders—Surendranath Banerjee, Anandamohan Basu, Rabindranath Tagore, Aurobindo Ghosh, Bipin Chandra Pal, Deshabandhu Chittaranjan Das.

F. Revolutionaries of Bengal—with special reference to Rashbehari Bose, Bagha Jatin, M. N. Roy, Khudiram, Benoy-Badal-Dinesh, Surya Sen & Chittagong Armoury Raid. Matangini Hazra, Netaji and I. N. A.

G. Regeneration of Bengal in the 20th Century :

(a) Swami Vivekananda, (b) Sister Nivedita, (c) Abanindranath Tagore, Asutosh Mukherjee, Jagadish Chandra Bose, Prafulla Chandra Ray, Aswini Kumar Dutta, Subhas Chandra Bose, Kazi Nazrul Islam, A. K. Fazlul Haque, Bidhan Chandra Ray.

H. Second Partition of Bengal (1947)—Boundaries of undivided Bengal and of partitioned Bengals (East Pakistan and West Bengal) with relevant historical background.

I. Rise of Bangladesh (1970-7) (i) Sheikh Mujibur Rahman—Career —Awami League. (ii) India's contribution towards the Freedom Struggle of Bangladesh.

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

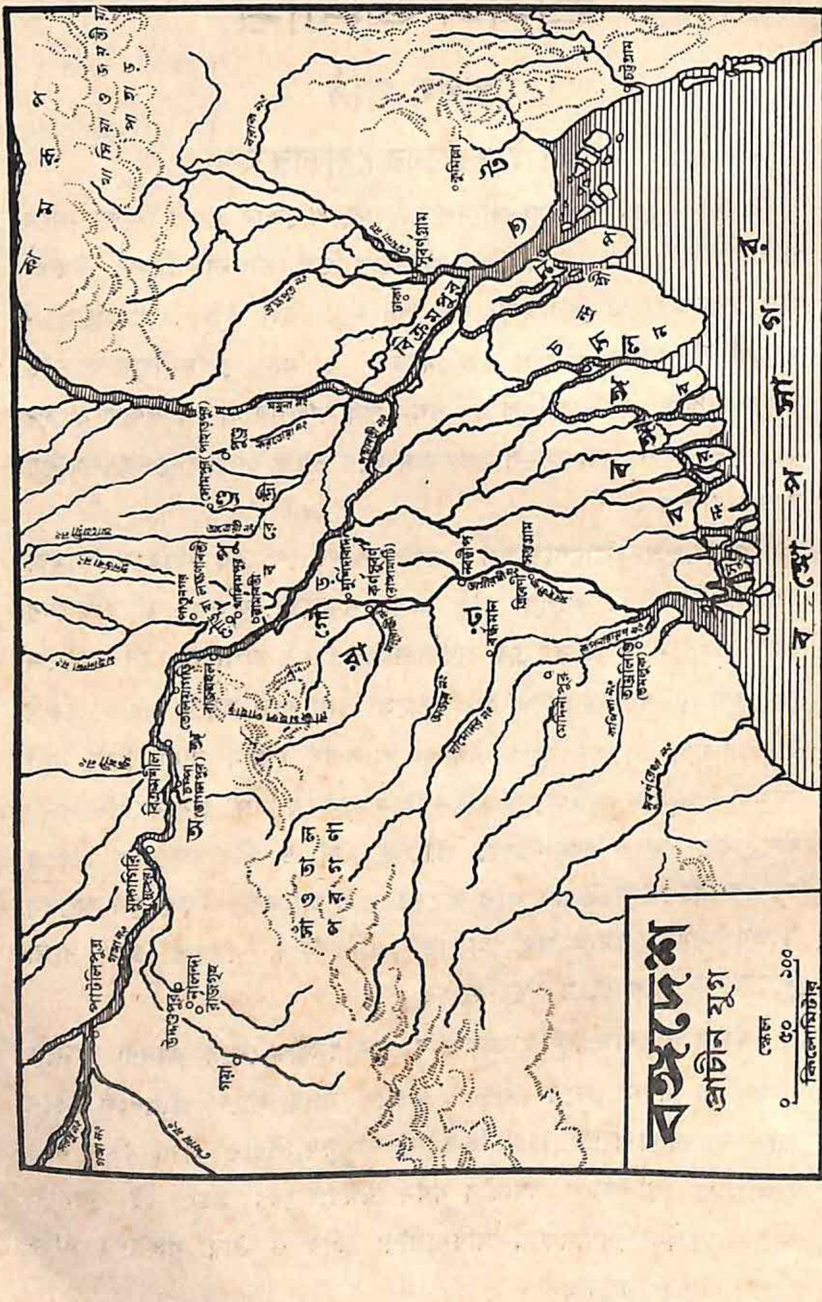
প্রথম পাঠ

বাংলা ইতিহাসের গোড়ার কথা

প্রাচীন যুগে সমস্ত বাংলাদেশ বা বঙ্গদেশ কোন একটি বিশেষ নামে পরিচিত ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। উত্তর-বঙ্গে রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলের নাম ছিল পুণ্ড্র এবং বরেন্দ্র। মালদহ-মুর্শিদাবাদকে বলা হত গৌড়। বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি রাঢ়দেশ বলে পরিচিত ছিল। তখন পূর্ব বাংলার দক্ষিণ অঞ্চলকে বঙ্গ বলা হত। পরবর্তী কালে মুসলমান যুগে সমস্ত বাংলাদেশের নাম হয় বঙ্গাল বা বঙ্গ।

বেদ ও মহাকাব্যের যুগ ঃ বাংলাদেশের গোড়ার ইতিহাস আমরা স্পষ্ট জানি না। আর্যরা পুণ্ড্র এবং সম্ভবতঃ বঙ্গের অধিবাসীদের কথা জানতেন। তাঁরা এই অঞ্চলগুলিকে এত অপবিত্র মনে করতেন যে কেউ এইসব জায়গায় এলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের যুগে এখানে আসবার কোন বাধা ছিল না। আমরা রামায়ণে দেখি, রামচন্দ্রের পিতা দশরথ 'বঙ্গ' জয় করেছিলেন। মহাভারত থেকে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ, কর্ণ ও ভীম বঙ্গদেশে বিভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে অভিযান করে তাদের বশে আনেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় বঙ্গদেশের রাজারা প্রতিশোধ নেবার জন্য রাজা দুর্যোধনের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

জৈন ও বৌদ্ধ যুগ ঃ একখানি জৈন ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগে রাঢ়দেশে কোন শহর বা রাস্তাঘাটের চিহ্ন ছিল না—অধিবাসীরাও সভ্য ছিল না। জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর যখন ধর্মপ্রচারের জন্য এই অঞ্চলে আসেন তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতি বিরূপ আচরণ করেছিল।


বঙ্গদেশ
প্রাচীন যুগ
স্কেল
০ ৫০ ১০০
কিলোমিটার

সিংহলের সঙ্গে যোগাযোগ ঃ একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে রাঢ়দেশের সিংহবাহুর বিজয়সিংহ নামে এক পুত্র ছিল। বিজয় অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন, তাই তাঁর পিতা তাঁকে নির্বাসন দণ্ড দেন। অনেকদিন পরে বিজয়সিংহ লঙ্কাদ্বীপ জয় করে সেখানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর বংশধররা পরবর্তী কালে তাঁর নাম স্মরণীয় করতে লঙ্কাদ্বীপের নাম দিয়েছিল সিংহল। এই কাহিনী অবশ্য কতটা সত্য তা কেউ ঠিক করে বলতে পারে না।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে বাংলা ঃ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকে গঙ্গা ও পদ্মার উপকূলে গঙ্গারিডই নামে একটি জাতি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তাদের এক বিশাল হস্তিবাহিনী ছিল বলে জানা যায়। মগধের (দক্ষিণ বিহার) নন্দবংশের সর্বশেষ রাজার সঙ্গে এদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই সময় গ্রীসের ম্যাসিডনের রাজা মহাবীর আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাব অধিকার করেন। গঙ্গাপারের রাজ্যগুলিও তাঁর জয় করবার ইচ্ছা হয়েছিল। মগধরাজ ও গঙ্গারিডইগণ একত্র হয়ে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এই সংবাদ যখন আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদের কাছে পৌঁছল তখন তারা আর কিছুতেই অগ্রসর হতে চাইল না। ফলে যুদ্ধ না করেই মহাবীর আলেকজাণ্ডার দুঃখিত মনে ফিরে গিয়েছিলেন।

গুপ্তযুগে বাংলা ঃ নন্দবংশের পর মৌর্যবংশের রাজারা মগধে রাজত্ব করতেন। সে সময় বাংলাদেশ সম্ভবতঃ মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে গঙ্গার মোহনায় আবার একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এর রাজধানী ছিল 'গঙ্গে' নামে একটি শহরে। সেখানে অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিন কাপড় তৈরী হত। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তবংশের সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত পুনরায় সমগ্র বাংলাদেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। তখন থেকে প্রায় দু'শ বছর গুপ্তবংশের সম্রাটদের দ্বারা নিযুক্ত শাসন-কর্তারাই বাংলাদেশ শাসন করতেন।

দ্বিতীয় পাঠ

গৌড়রাজ শশাঙ্ক

উত্তর ভারতে গুপ্তসম্রাটদের আধিপত্য প্রায় দু'শ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তারপর তাঁদের সাম্রাজ্য ক্রমে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। তখন বাংলাদেশের কয়েকজন রাজা নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছিলেন। ক্রমে ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে উত্তরপ্রদেশের কান্যকুব্জ অঞ্চলের মৌখরিগণ, পূর্ব পাঞ্জাবে অবস্থিত থানেশ্বরের পুষ্যভূতিগণ এবং বাংলাদেশের গৌড়গণ বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন উত্তর ভারতে আবার সাম্রাজ্য গড়ে তোলবার জন্য তাদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। মৌখরিরাজ ঈশানবর্মণের হাতে গৌড়দের শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু এর পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে গৌড়রাজ শশাঙ্ক মৌখরিদের রাজধানী কান্যকুব্জ অধিকার করে এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

শশাঙ্কের পিতৃপরিচয়, বা কি করে তিনি গৌড়ের রাজা হয়েছিলেন তা জানা যায় না। তিনি সম্ভবতঃ কোন রাজার মহাসামন্ত ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটির নিকট তাঁর রাজধানী ছিল। প্রাচীনকালে এই স্থানটির নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ। শশাঙ্ক যে শুধু বিচক্ষণ রাজা ছিলেন তা নয়, যুদ্ধবিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রাজ্যবিস্তার করতে মনস্থির করলেন। তিনি দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) এবং কোঙ্গোদ (দক্ষিণ উড়িষ্যায় অবস্থিত গঞ্জাম জেলার অংশ) জয় করেন। তাছাড়া পশ্চিমে মগধ রাজ্যও তিনি জয় করেন। অনেকে মনে করেন, তিনি পূর্ববঙ্গেও তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বাংলাদেশের বাইরে রাজ্যবিস্তার করে শশাঙ্কই প্রথম খ্যাতিলাভ করেছিলেন। শশাঙ্ক যখন মগধ জয় করলেন তখন মৌখরিদের সঙ্গে গৌড়দের আবার যুদ্ধের

সম্ভাবনা দেখা দিল। মৌখরিরাজ গ্রহবর্মণ থানেশ্বরের রাজা পুষ্যভূতি বংশের প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করেন। এর ফলে তাঁদের দুজনেরই ক্ষমতা বেড়ে যায়। এঁদের শক্তি খর্ব করবার জন্য শশাঙ্ক মৌখরিদের পরম শত্রু মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করলেন। এর কিছুকাল পরে দেবগুপ্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে মৌখরিদের রাজধানী কান্যকুব্জ অধিকার করে গ্রহবর্মণকে মেরে ফেলেন। তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রীকে বন্দী করা হল। মৌখরিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে দেবগুপ্ত থানেশ্বর আক্রমণ করবার জন্য রওনা হন। তখন সেখানে প্রভাকরবর্ধনের পুত্র রাজ্যবর্ধন রাজত্ব করছিলেন। তিনি তাঁর ভগ্নীপতির মৃত্যু ও ভগ্নী রাজ্যশ্রীর বন্দী হবার খবর পেয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধনের উপর রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করলেন এবং নিজে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কান্য-কুব্জের দিকে এগিয়ে আসছিলেন।

পথে দেবগুপ্তের সঙ্গে রাজ্যবর্ধনের প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হলেন। এর পূর্বেই শশাঙ্ক তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কান্যকুব্জে পৌঁছে গেলেন। তাঁর হাতে রাজ্যবর্ধন নিহত হলেন। হর্ষবর্ধনের বন্ধু ও চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ আর তার সভা-কবি বাণভট্ট লিখেছেন যে রাজা শশাঙ্ক নিজের শিবিরে রাজ্যবর্ধনকে আমন্ত্রণ করে ডেকে আনেন; এরপর তাঁকে হত্যা করা হয়। কিন্তু এই কাহিনী অনেকে বিশ্বাস করেন না।

গ্রহবর্মণ ও রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর কান্যকুব্জ ও থানেশ্বরের গণ্য-মান্য ব্যক্তিরা একত্রে মিলিত হয়ে হর্ষবর্ধনকে দুই রাজ্যের রাজা বলে ঘোষণা করলেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে হর্ষবর্ধনের মনে এত দুঃখ হল যে তিনি পৃথিবীর বুক থেকে গৌড়ের নাম চিরকালের জন্য মুছে ফেলবার প্রতিজ্ঞা করলেন; আরও প্রচার করলেন যে, যদি তা না পারেন তবে নিজের দেহ অগ্নিতে বিসর্জন দেবেন। এরপর আরম্ভ হল শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান। পথে শুনতে পেলেন

যে ভগ্নী রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে পলায়ন করে বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় নিয়েছেন। হর্ষবর্ধন নিজে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করবার জন্য বিন্ধ্যপর্বতে চলে গেলেন ; আর শশাঙ্কের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষকে আদেশ দিলেন। এদিকে রাজ্যশ্রী মনের দুঃখে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করবার জন্য যখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে ভ্রাতা-ভগ্নীর মিলন হল।

হর্ষবর্ধন ভগ্নীকে উদ্ধার করে নিজের সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হন। শশাঙ্ককে শাস্তি দেবার জন্য তিনি কামরূপের রাজা (আসাম) ভাস্করবর্মার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, শশাঙ্ককে হর্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এর ফলে তাঁকে কান্যকুব্জ ছেড়ে চলে আসতে হয়। কিন্তু এই পরাজয়ে শশাঙ্কের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি। এরপরও তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত সগৌরবে রাজত্ব করেছিলেন তার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়।

শশাঙ্কের আরাধ্যদেবতা ছিলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর। হিউয়েন সাঙ্ তাঁকে প্রচণ্ড বৌদ্ধবিদ্বেষী বলে বর্ণনা করেছেন। যে বৃক্ষটির তলে বুদ্ধদেব ধ্যান করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন শশাঙ্ক নাকি সেটি সমূলে তুলে ফেলেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হিউয়েন সাঙ্ নিজেই বলেছেন যে, শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে তিনি অনেক বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন। তাই শশাঙ্ককে কেন হিউয়েন সাঙ্ বৌদ্ধবিদ্বেষী বলেছেন তা ঠিক বোঝা যায় না।

শশাঙ্ক সমগ্র বাংলা তাঁর শাসনাধীনে এনে বাঙালীর মধ্যে সর্ব-প্রথম ঐক্যস্থাপন করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম বাংলার বাইরে রাজ্যবিস্তার করে বাঙালীর গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন এবং হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সমানে সমানে যুদ্ধ করে তাঁর রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এইসব কারণেই বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্ক অক্ষয় কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

তৃতীয় পাঠ

পাল সাম্রাজ্য

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের অধিকার নিয়ে বড় বড় রাজাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। প্রথমেই হর্ষবর্ধন ও তাঁর মিত্র ভাস্কর-বর্মন ছদিক থেকে বাংলাদেশে রাজ্য বিস্তার করেন। তার কিছুকাল পরে যশোবর্মণ নামে কান্যকুব্জের আর একজন রাজা ও কাশ্মীরের ছ'জন রাজা গৌড় রাজ্য জয় করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু এদের মধ্যে কেউই বেশীদিন এখানে রাজত্ব করতে পারেননি। ফলে তখন ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বণিক যে যেখানে পারল রাজা হয়ে বসল আর তারা একে অন্যের সঙ্গে মারামারি, কাটাকাটি করতে থাকল। এতে দেশবাসীদের কারুর প্রাণ বা ধনসম্পত্তি কিছুই নিরাপদ ছিল না। বাংলার ইতিহাসের এই সময়কে 'মাৎস্য ন্যায়ের যুগ' বলা হয়; অর্থাৎ যেমন জলাশয়ে বড় মাছেরা ছোট মাছগুলি খেয়ে ফেলতে আরম্ভ করলে সমস্ত মাছেদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যেও সেইরকম অবস্থা হয়েছিল।

এই 'মাৎস্য ন্যায়' থেকে যাতে রক্ষা পাওয়া যায় তার জন্য বাংলার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, রাজাপ্রজা সকলে একত্র হয়ে গোপাল নামে একজন অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সমগ্র বাংলাদেশের অধিপতি বলে ঘোষণা করেন। বাংলাদেশে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গোপালের নাম ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। গোপাল রাজা হয়ে বাংলাদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। সম্ভবতঃ সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তিনি একজন আদর্শ রাজা ছিলেন বলে প্রশংসা অর্জন করেছেন।

গোপালের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল বাংলাদেশের রাজা হলেন। তাঁর রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময় উত্তর ভারতের আধিপত্য নিয়ে আবার সংগ্রাম শুরু হয়। এবার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন রাজপুতানার

প্রতিহারবংশের রাজারা, দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটগণ এবং বাংলার পালবংশের নৃপতিগণ। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। ধর্মপালের সময়ই সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তাঁর সময়ে উত্তর ভারতের কান্যকুব্জ ছিল ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ নগরী। এই শহরটি জয় করতে পারলে তখনকার রাজারা খুব গর্ব অনুভব করতেন। শশাঙ্কের মত ধর্মপালও কান্যকুব্জ জয় করবার জন্য অগ্রসর হন। ওদিকে প্রতিহারের রাজা বৎসরাজও ঐ একই উদ্দেশ্য নিয়ে সসৈন্যে পূর্বদিকে আসছিলেন। কাজেই দু'পক্ষে যুদ্ধ বেধে গেল। ধর্মপাল পরাজিত হলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়েই রাষ্ট্রকূটদের রাজা ধ্রুব উত্তর ভারত আক্রমণ করে বৎসরাজ ও ধর্মপাল দুজনকেই পরাজিত করলেন। বৎসরাজ রাজপুতানার মরুভূমিতে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু ধ্রুব উত্তর ভারতে থাকলেন না। এতে ধর্মপালের বিশেষ সুবিধা হয়। তিনি নির্বিবাদে রাজ্য বিস্তার করবার সুযোগ পেলেন। পাঞ্জাব থেকে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত উত্তর ভারতে তিনি নিজস্ব আধিপত্য স্থাপন করলেন। কান্যকুব্জ জয় করে ধর্মপাল তাঁর আশ্রিত চক্রায়ুধ নামে এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। তখন উত্তর ভারতের সমস্ত রাজা একত্রিত হয়ে তাঁকে 'সার্বভৌম সম্রাট' বলে মেনেনেন।

ধর্মপাল কতদিন পর্যন্ত তাঁর প্রভুত্ব কান্যকুব্জের উপর অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না। বৎসরাজের পুত্র নাগভট সৌরাষ্ট্র, মালব প্রভৃতি রাজ্য জয় করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করেন। তারপর কান্যকুব্জ জয় করে সেখান থেকে চক্রায়ুধকে তাড়িয়ে দিলেন। এরপর তিনি বাংলাদেশের সীমান্তে এসে উপস্থিত হন। বিহারে মুঙ্গেরের নিকট ধর্মপালের সঙ্গে তাঁর তুমুল সংগ্রাম হয়। কিন্তু এবারও রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের পুত্র গোবিন্দ এসে নাগভটকে পরাজিত করেন। ধর্মপাল এবং চক্রায়ুধও স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রকূটদের কাছে নতি স্বীকার করেন। কিন্তু পিতার মত গোবিন্দও উত্তর ভারত ছেড়ে

চলে যান। অনেকে বলেন, ধর্মপাল মৃত্যু পর্যন্ত উত্তর ভারতে তাঁর আধিপত্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

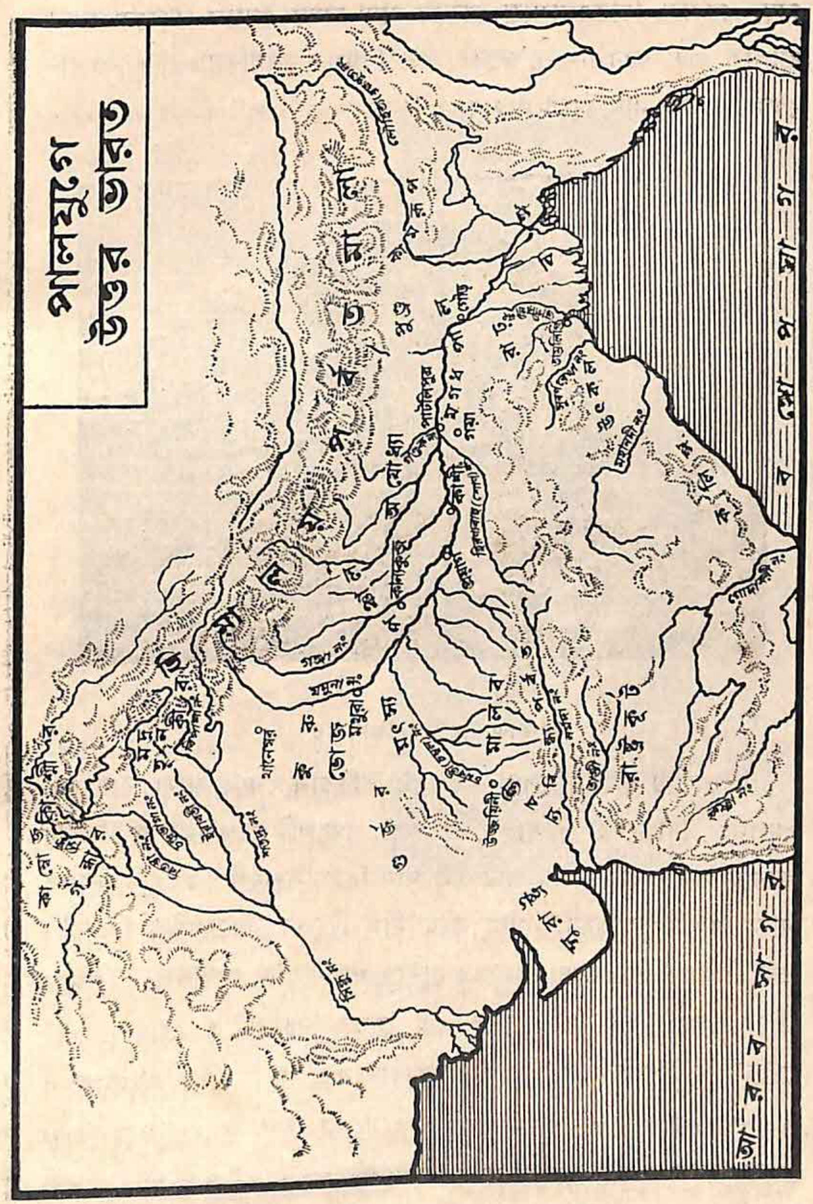
ধর্মপালের পর তাঁর পুত্র দেবপাল রাজা হলেন। তিনি তাঁর পিতার মতই শক্তিশালী ছিলেন। তার প্রধান সহায় ছিল তাঁর দুজন মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ দর্ভপাণি এবং তাঁর পৌত্র কেদার মিশ্র। তাঁর সভাকবি প্রশংসা করে লিখেছেন যে দেবপালের রাজত্ব হিমালয় থেকে সেতুবন্ধ এবং পশ্চিম সমুদ্র থেকে পূর্ব সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এটা হয়তো তিনি একটু বাড়িয়েই লিখেছিলেন। পিতার মত দেবপালও যে উত্তর ভারতে সমরাভিযান করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার ভয়ে উৎকলের রাজা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যান; আসামের রাজা বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন। আর একদল সৈন্য কাশ্মীরের দক্ষিণে কম্বোজ রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়ে হূণদের পরাজিত করে। পশ্চিম ভারতে নাগভটের পৌত্র ভোজ এবং দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট-রাজার গর্বও খর্ব করা হয়। এইভাবে দেবপালের রাজত্বকালে অন্ততঃপক্ষে কিছুকালের জন্য পালবংশের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু দেবপালের রাজত্বের শেষ দিকে প্রতিহাররাজ ভোজ কান্যকুব্জ অধিকার করেন। তবুও দেবপালের খ্যাতি ভারতবর্ষের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুবর্ণদ্বীপের রাজা (সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মালয়) দেবপালের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া এই রাজার প্রতিষ্ঠিত নালন্দার এক বৌদ্ধবিহারের সমস্ত ব্যয় বহন করবার জন্য দেবপাল পাঁচখানি গ্রাম দান করেন।

পালযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঃ পাল বংশের প্রতিষ্ঠা থেকে দেবপালের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় একশ' বছর অতিবাহিত হল। এই একশ' বছর নানা দিক দিয়ে বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ। ধর্মপাল এবং দেবপাল শুধু রাজ্যবিস্তার করে খ্যাতিলাভ করেননি। বাংলাদেশে যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হয়, বাঙালী জাতি যাতে সাংস্কৃতিক উন্নতি লাভ করতে পারে, সেজন্যও তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন।

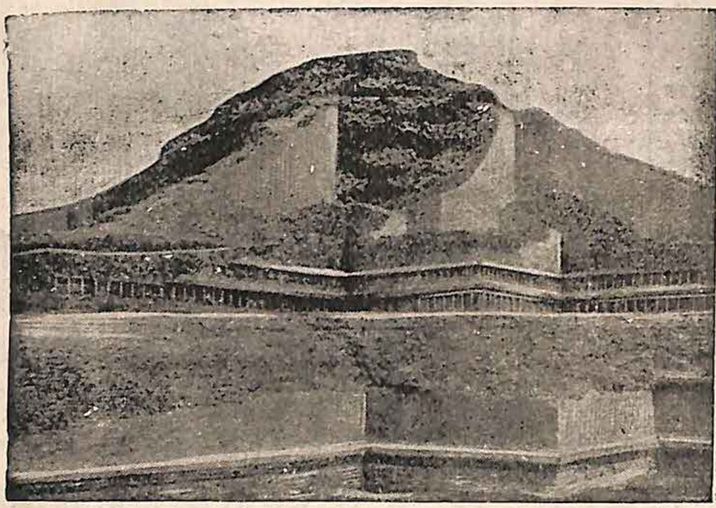
তাঁরা ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিতদের ভূমি দান করে শাস্ত্রচর্চা ও পুস্তক রচনা করতে উৎসাহ দিতেন। সেকালের দলিলপত্র থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে তখন সংস্কৃত ভাষার বেশ চর্চা ছিল। বাঙালী পণ্ডিতগণ বেদ, বেদান্ত, জ্যোতিষ শাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি বহু বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। বড় বড় রাজপুরুষরাও যে এসকল বিষয় চর্চা করতেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

গোপাল, ধর্মপাল এবং দেবপাল এবং তাঁদের পরে যাঁরা পালবংশের রাজা হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। পালযুগের প্রথম থেকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া এই সময় বৌদ্ধভক্তগণ উৎসাহ পেয়ে অনেক গান ও দোঁহা রচনা করেন। এইগুলিকে বলা হয় 'চর্যাপদ'। চর্যাপদ সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষায় লেখা হয়েছে। যেমন একটি পদ এই রকম, "নানা তরুবর মৌউলিলরে, গগণত লা গেলী ডালী" অর্থাৎ নানা তরু মুকুলিত হল, গগন স্পর্শ করল ডাল। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে বৌদ্ধ দোঁহাগুলিতে যে প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার পাওয়া যায় তার থেকেই প্রাচীনতম বাংলা ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। এই ভাষায় বিষ্ণু এবং কৃষ্ণ সম্বন্ধে কয়েকটি গীতি-কবিতাও পাওয়া গেছে, এগুলিকে বৈষ্ণব পদাবলীর আদি রূপ বলে বর্ণনা করা যায়। তোমরা বড় হলে এ সম্বন্ধে আরও জানতে পারবে।

এখনকার বিহার প্রদেশের নালন্দায় অনেক দিন থেকে একটি পৃথিবী বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এখানে ভারতবর্ষের দূর দূর দেশ থেকে বহু ছাত্র পড়তে আসত; তা'ছাড়া আসত চীন, দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্য এশিয়ার নানাস্থানের ছাত্রগণ। বাংলাদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত শীলভদ্র যখন নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন তখন এখানে পড়তে এসেছিলেন চীনদেশের পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্। তিনি তাঁর বিবরণীতে শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেছেন। তাঁর বই থেকে আমরা জানতে পারি যে তখন নালন্দাতে দশহাজার ছাত্র পড়াশুনা করত। বৌদ্ধশাস্ত্র ছাড়াও


পালযুগে
উত্তর ভারত

বেদ, বেদান্ত, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয় এখানে পড়ানো হত। ধর্মপাল এবং দেবপাল দু'জনেই এই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নানাভাবে সাহায্য করতেন।



পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার

তিব্বতীয় ভাষায় লেখা একখানি ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ধর্মপাল বৌদ্ধদের শিক্ষালাভের জন্য পঞ্চাশটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করেছিলেন। ধর্মপালের আর এক নাম ছিল বিক্রমশীল; তিনি নিজের নামে একটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করে নাম দিলেন 'বিক্রমশীল বিহার'। এই বিহারটি ভারত ও ভারতের বাইরে খ্যাতিলাভ করেছিল। গঙ্গার তীরে একটি পাহাড়ের উপরে এই সুন্দর বিহারটিতে প্রায় একশ' চৌদ্দ জন শিক্ষক নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। তিব্বত থেকে যে সকল বৌদ্ধ আচার্য এখানে পড়তে আসতেন তাঁরা দেশে ফিরে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক সংস্কার করতে পেরেছিলেন। এই যুগে আর একটি বিখ্যাত বিদ্যায়তন ছিল ওদন্তপুরী বিহার। এরই অনুকরণে তিব্বতে সর্বপ্রথম বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করা হয়।

এই যুগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বাঙ্গালী শিল্পীরা কতদূর উন্নতি করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ধর্মপালের নির্মিত আর একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে। এই বিহারটি পাওয়া গেছে রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে। এর চারিদিক প্রাচীরে ঘেরা ছিল। অঙ্গনের মধ্যে ছিল একটি প্রকাণ্ড মন্দির। মন্দিরের চারপাশে ছোট ছোট মন্দির, স্নানাগার, ভোজনালয় ছিল। মন্দিরের গায়ে পাথর ও পোড়ামাটির ফলকে অপূর্ব কারুকার্য দেখা যায়। এছাড়া এযুগের অনেক সুন্দর সুন্দর পাথরে তৈরী দেবদেবীর মূর্তিও পাওয়া গেছে। পালরাজারা নিজেরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেও হিন্দু দেবদেবীর মন্দির নির্মাণে যে উৎসাহী ছিলেন তার প্রমাণ আমরা এর থেকেই পাই। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ছাড়া চিত্রশিল্পেও যে বাঙালী শ্রেষ্ঠ ছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায় কতকগুলি হাতে লেখা পুঁথির ছবি থেকে। তবে এগুলি ধর্মপাল ও দেবপালের কিছু পরে আঁকা হয়েছিল। সাধারণতঃ ভারতবর্ষের মন্দির ও বিহারগুলির প্রাচীরের গায়ে নানা রকম চিত্র অঙ্কিত থাকত। বাংলাদেশেও অনুরূপ চিত্র ছিল, তবে সবই ধ্বংস হয়ে গেছে।



পালযুগের ভাস্কর্য

ধর্মপালের বিহারগুলিতে তিব্বতীয় পণ্ডিত ও আচার্যগণ পাঠ সমাপ্ত

করে দেশে গিয়ে ধর্মসংস্কার করতেন, একথা আগেই বলেছি। বাঙালী বৌদ্ধ আচার্যগণও তিব্বতে যেতেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন পূর্ব ভারতের আচার্য পণ্ডিত ধর্মপাল। সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম ছিল অতীশ। যখন ওদন্তপুর বিহার থেকে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা সমাপ্ত করেন তখন সেখানকার আচার্য শীলরক্ষিত তাঁর নাম দিলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও আগ্রহ দেখেই এই নাম দেওয়া হয়। রাজা প্রথম মহীপাল তাঁকে বিক্রমশীল বিহারে আমন্ত্রণ জানালেন এবং কিছুদিন পরে এই বিহারের আচার্যপদে নিযুক্ত করে সম্মানিত করেন।

তাঁর কথা জানতে পেরে তিব্বতের রাজা বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের জন্য তাঁকে নিজের দেশে আমন্ত্রণ করেন। প্রথমে দীপঙ্কর রাজী হননি। কিন্তু পরে যখন দীপঙ্কর জানতে পারলেন যে এই রাজা শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন তখন তাঁর করুণ আহ্বানে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। তিব্বতে গিয়ে তিনি মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কার ও প্রচার করলেন। তিনি তিব্বতে বহু সম্মান পেয়েছিলেন। এখনও সেখানকার মানুষেরা তাঁকে ভক্তি করে। তিনি শেষ পর্যন্ত তিব্বতেই মারা যান। এই পৃথিবী-বিখ্যাত পণ্ডিত বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে আজও আমরা তাঁর নাম স্মরণ করি।

এতক্ষণ পালবংশের যে সব কথা বলা হল তা শুধু রাজারাজড়াদেরই কথা নয়; এ যুগের ইতিহাসে সমগ্র বাঙালী জাতির বিভিন্ন বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষরও রয়েছে।

চতুর্থ পাঠ

পাল সাম্রাজ্যের অবসান

দেবপালের পর রাজা হন বিগ্রহপাল। তিনি সব সময় ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। সংসারের প্রতি তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। কাজেই শাসন-ব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ল। তখন থেকেই পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়ে যায়। অল্প কয়েক বছর রাজত্বের পর পুত্র নারায়ণপালকে সিংহাসনে বসিয়ে বিগ্রহপাল বানপ্রস্থ অবলম্বন করলেন। নারায়ণপাল পঞ্চাশ বছরেরও বেশী রাজত্ব করেন। আমরা এর পূর্বে দেখেছি যে প্রতিহারবংশের রাজা ভোজ দেবপালের রাজত্ব-কালেই কান্যকুব্জ অধিকার করেছিলেন। তখন উত্তর ভারতে তাঁকে বাধা দেয় এমন কেউ ছিল না। তিনি সম্ভবতঃ নারায়ণপালের রাজত্ব-কালে মগধের কিছু অংশ জয় করে নিয়েছিলেন। এরপর ভোজের পুত্র মহেন্দ্র মুঙ্গের জয় করেন এবং আরও কিছুকাল পরে তিনি উত্তর বঙ্গেও প্রতিহার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। সুযোগ পেয়ে রাষ্ট্রকূটরাও একবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেছিলেন। নারায়ণপাল তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে প্রতিহারদের বিজিত অঞ্চলের কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন।

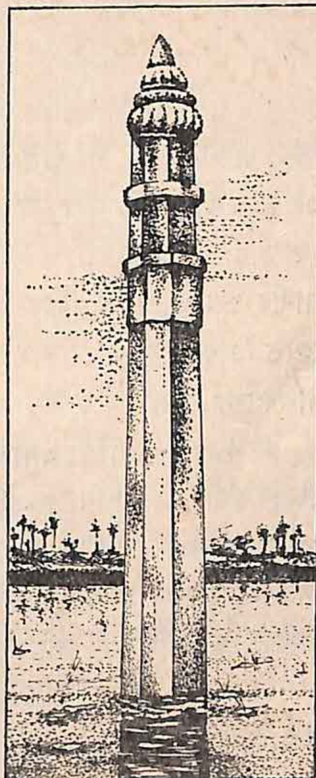
কিন্তু বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য ক্রমেই বেড়ে চলছিল। নারায়ণপালের মৃত্যুর পরে যাঁরা রাজা হয়েছিলেন রাজ্যশাসনে তাঁরাও কোন যোগ্যতা দেখাতে পারেননি। সে সময় প্রতিহার রাজাদেরও তেমন শক্তি ছিল না। কিন্তু তাঁদের অধীনস্থ সামন্ত রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশ আক্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায়। সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছিল কম্বোজ নামে একটি পার্বত্য জাতি। সম্ভবতঃ তারা হিমালয়ের কোন স্থান থেকে এসেছিল। তারা পালবংশের অধিকার থেকে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ ছিনিয়ে নেয় এবং সেখানে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। এই গোলযোগের সময় পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গেও দু'তিনটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল।

প্রথম মহীপাল ঃ দেবপালের মৃত্যুর প্রায় দেড়শ' বছর পরে একজন প্রকৃত শক্তিশালী রাজা পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রথম মহীপাল নামে পরিচিত। তিনি কম্বোজদের পরাজিত করে পিতৃরাজ্যের কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন। বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের রাজারাও সম্ভবতঃ তাঁর আধিপত্য মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে তামিলনাড়ুর রাজা রাজেন্দ্র চোল উড়িষ্যা জয় করে দক্ষিণ বঙ্গের রাজ্যগুলি আক্রমণ করেন। তিনি রাঢ় ও 'বঙ্গের' রাজাদের পরাজিত করেন এবং মহীপালকে আক্রমণ করে তাঁর ধনরত্ন ও হাতী লুঠ করে নিয়ে যান। কিন্তু পালরাজ্যের বিশেষ কোন ক্ষতি হল না। মহীপাল অনেকগুলি মঠ, মন্দির ও বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ এবং কতগুকলি শহর ও দীঘির প্রতিষ্ঠা করেন। এইগুলি মহীপালের স্মৃতি এখনও বহন করছে।

বাংলাদেশে "ধান ভানতে মহীপালের গীত" এই রকম একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। এ থেকে বোঝা যায় যে মহীপাল জনপ্রিয় রাজা ছিলেন এবং লোকে তাঁর কীর্তিকলাপ বর্ণনা করে গান রচনা করেছিল।

কৈবর্ত বিদ্রোহ ঃ প্রথম মহীপালের মৃত্যুর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আবার বাংলাদেশে নানা গোলমাল দেখা দিল। এই সময়ে দ্বিতায় মহীপাল রাজত্ব করতেন। তিনি তাঁর মন্ত্রীদের কোন পরামর্শ গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেন না। এইজন্য রাজপরিবারের মধ্যেই গণ্ডগোল শুরু হয়। তখন মহীপাল তাঁর ভাই শূরপাল ও রামপালকে সকল রকম অনিষ্টের মূল ভেবে কারারুদ্ধ করেন। তাঁর অত্যাচারে রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। দিব্বোক নামে একজন কৈবর্ত নায়ক উত্তর বাংলার স্বাধীন রাজা হয়ে দ্বিতীয় মহীপালকে যুদ্ধে হত্যা করলেন। বাংলার অবশিষ্ট অংশগুলিও অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের হাতে চলে গিয়েছিল। বাংলাদেশে যেসকল প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে তাতে দিব্বোককে একজন ন্যায়পরায়ণ সুদক্ষ রাজা বলে প্রশংসা করা

হয়েছে। দিব্বোকের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা রুদোক ও রুদোকের পুত্র ভীম পর পর উত্তর বঙ্গের রাজা হন। ভীমও জনপ্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে নানা রকম কাহিনী প্রচলিত আছে।



দিব্বোকের স্মৃতিস্তম্ভ

রামপাল ও পালসাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঃ দ্বিতীয় মহীপালের মৃত্যুর পর যে সামান্য অংশটুকু তখনও পালদের অধীনে ছিল সেখানে প্রথমে রাজা হলেন শূরপাল এবং তারপর তাঁর ভাই রামপাল। পিতৃ-রাজ্য উদ্ধার করবার জন্য রামপাল বাংলাদেশের বিদ্রোহী সামন্ত রাজাদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে লাগলেন। প্রচুর অর্থ ও জমিজমার বদলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত রামপালকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তখন ভীমের সঙ্গে রামপালের তুমুল যুদ্ধ হয়। ভীম জীবিত অবস্থায়ই বন্দী হন। কিন্তু তাঁর এক বন্ধু কৈবর্ত সৈন্যদের একত্রিত করে পুনরায় রামপালের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য এগিয়ে আসেন। কিন্তু রামপাল প্রচুর অর্থ দিয়ে তাঁকেও বশীভূত করলেন। এইভাবে উত্তর বঙ্গে আবার পাল রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

রামপাল সাহসী ও খুব শক্তিশালী ছিলেন বলেই উত্তর বাংলার সকল অঞ্চল পালবংশের অধীনে আনতে পেরেছিলেন। ক্রমে তিনি পূর্ব বাংলাও তাঁর রাজ্যের মধ্যে আনলেন এবং কামরূপ জয় করে নিলেন। কান্যকুব্জ, উৎকল ও দাক্ষিণাত্যের রাজাদের সঙ্গে তাঁর

যুদ্ধ হয়েছিল। এইভাবে শুধু বাংলাদেশ নয়, বাংলাদেশের বাইরেও তিনি রাজ্যবিস্তার করেছিলেন।

রামপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিলেন। উত্তর বঙ্গে রামাবতী নামে তিনি একটি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। সাধারণ প্রজাদের যাতে কষ্ট না হয় সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। তাদের উপর যেসব কর চাপান হত তার কতকগুলি তিনি রহিত করে দেন। তাঁর সময় বাংলাদেশে আবার সুখ ও শান্তি ফিরে এসেছিল বলে তাঁর স্মৃতি এখনও লোক-সঙ্গীত ও কাহিনীতে বেঁচে আছে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে পালবংশের গৌরব মুছে যায়।

সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রঃ রামপালের সভাকবি ছিলেন সন্ধ্যাকর নন্দী। তিনি 'রামচরিত' নাম দিয়ে একখানি অপূর্ব কাব্যগ্রন্থ লিখে গেছেন। এই কাব্যের শ্লোকগুলি এমন কৌশল করে রচিত যে সেগুলির দু'রকম অর্থ করা যায়। এক অর্থে রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্রের কাহিনী জানা যায়। আবার অন্য অর্থে পালরাজ রামপালের কীর্তি-কলাপের বর্ণনা পাওয়া যায়। রামপালের রাজত্বের ইতিহাস জানতে এই কাব্যখানি আমাদের খুবই সাহায্য করে।

পাল বংশের অবনতির যুগে বাংলাদেশে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম চক্রপাণি দত্ত। তাঁর পিতা কোন একজন পালরাজার রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান করতেন। অতি প্রাচীন কালে চরক ও সুশ্রুত নামে দু'জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক দু'খানি বই লিখেছিলেন। এই বই দু'খানি 'চরক' ও 'সুশ্রুত সংহিতা' নামে পরিচিত। চক্রপাণি দত্ত এই বইদুখানির টীকা লিখে যশস্বী হয়েছেন। তিনি নানারকমের গাছ-গাছড়া ও রাসায়নিক দ্রব্য সম্বন্ধে দু'খানি পৃথক পুস্তক রচনা করেছিলেন।

পঞ্চম পাঠ

সেনবংশের রাজত্বকাল

সেনবংশের প্রতিষ্ঠাঃ রামপালের মৃত্যুর পর যখন পালরাজারা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন তখন তাঁদের রাজ্যের এখানে ওখানে অনেকে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করেন। এইসব ছোট ছোট রাজাদের মধ্যে রাঢ় অঞ্চলের সেনবংশের রাজারা ক্রমে সমস্ত বাংলাদেশে নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁদের রাজত্বকালে বাংলার সেই হারিয়ে-যাওয়া গৌরবময় দিনগুলি আবার ফিরে এসেছিল।

সেন রাজাদের পূর্বপুরুষরা দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশের ক্ষত্রিয় ছিলেন। কখন এবং কেন তাঁরা বঙ্গদেশে এসেছিলেন তা আমরা এখনও ভাল করে জানি না। এটুকু কিন্তু আমাদের জানা আছে যে সেই যুগে দাক্ষিণাত্যের কয়েকজন খুব শক্তিশালী রাজা পূর্ব ভারতে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এইরকম এক দক্ষিণদেশীয় সৈন্যদলের সঙ্গে সেনবংশের পূর্বপুরুষ সামন্তসেন বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি গঙ্গাতীরে বাস করবার জন্য এদেশে থেকে যান। সেই সময় থেকে বাংলাদেশে সেনবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। অনেকে মনে করেন যে সামন্তসেন দ্বিতীয় মহীপালের রাজত্বকালে বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে রাঢ় অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন।

সামন্তসেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হেমন্তসেন রাজা হন। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। সেনবংশের রাজাদের মধ্যে শেষ তিনজন রাজাই খুব খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এঁদের নাম হল বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন।

বিজয়সেনঃ বিজয়সেন ছিলেন সেনবংশের সর্বপ্রথম স্বাধীন রাজা। তিনি রাঢ়দেশের শূরবংশের রাজকন্যাকে বিবাহ করে নিজের শক্তি খুব বাড়িয়েছিলেন। এরপর তিনি সমস্ত রাঢ় অঞ্চল তাঁর

অধীনে আনেন। ক্রমে তিনি পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ জয় করেন। তাছাড়া তিনি গৌড়, উত্তর বিহার, মিথিলা (উড়িষ্যা) ও আসামের রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে দেন। গৌড় অঞ্চলে তখনও পালবংশের একজন রাজা রাজত্ব করছিলেন।

বিজয়সেনের রাজধানী হুগলী জেলার প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান ত্রিবেণীর কাছে ছিল। তিনি তাঁর নিজের নামে রাজধানীর নাম রেখেছিলেন বিজয়পুর। পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে তাঁর আর একটি রাজধানী ছিল। তিনি অনেকগুলি বড় বড় মন্দির ও দীঘি খনন করান। কবি উমাপতি ধরের প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে বিজয়সেন বাংলাদেশে আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্ব করার পর তাঁর মৃত্যু হয়।

বল্লালসেন ঃ বিজয়সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লালসেন রাজা হলেন। তাঁর সম্বন্ধে বাংলাদেশে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। তার থেকে জানতে পারা যায় যে তিনি তাঁর পিতার মতই গৌড় ও মিথিলার রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। আরো জানা যায় যে বল্লালসেন যুদ্ধবিগ্রহ অপেক্ষা ধর্মকর্ম ও সমাজসংস্কার করতে বেশী পছন্দ করতেন। তিনি ব্রাহ্মণদের অনেক দানধ্যান করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে বল্লালসেন পুত্র লক্ষ্মণসেনের উপর রাজ্যের ভার দিয়ে সস্ত্রীক বানপ্রস্থে যান।

লক্ষ্মণসেন ঃ লক্ষ্মণসেন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর বয়স প্রায় ষাট। ছেলেবেলা থেকেই তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তিনি তাঁর পিতামহ বিজয়সেনকে গৌড়, উড়িষ্যা ও আসামের রাজাদের পরাজিত করতে সাহায্য করেছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সময়ে এই তিনটি রাজ্যই সেনরাজবংশের অধীনে আসে। এছাড়া মগধ জয় করে তিনি কাশীর রাজাকেও পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ তিনি এক সময় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ পর্যন্ত সসৈন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। এইভাবে সমস্ত দিক জয় করে তিনি পুরী, বারাণসী ও প্রয়াগের তীরে তাঁর বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন।

লক্ষ্মণসেন আশী বছরেরও বেশী বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি ধর্মকর্ম, শাস্ত্র আলোচনা ও কাব্যচর্চার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতেন। এই সময় রাজ্যের মধ্যে কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেই সুযোগে সুন্দরবনের কাছে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। তারপর একদিন মুসলমানরা হঠাৎ নবদ্বীপ আক্রমণ করে বসল। তখন লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে (বিক্রমপুরে) পালিয়ে গেলেন। এইসঙ্গে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে সেনবংশের রাজত্বের অবসান হয়।

লক্ষ্মণসেনকে অনেকে ভীরু ও কাপুরুষ বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু এই ঘটনার কিছু আগে রাজসভার জ্যোতিষীগণ নাকি বলেছিলেন যে বাংলাদেশে ম্লেচ্ছদের রাজত্ব স্থাপিত হবে। একথা শুনে অনেক রাজকর্মচারী ও নবদ্বীপের লোক শহর ছেড়ে আগেই চলে গিয়েছিল। লক্ষ্মণসেন কিন্তু তাদের সঙ্গে আগেভাগেই পালিয়ে যেতে অস্বীকার করেছিলেন। কাজেই তিনি যে ভীরু অথবা কাপুরুষ ছিলেন একথা মনে হয় না। অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালিয়েই বখ্‌তীয়ার নবদ্বীপ দখল করে নিতে পেরেছিলেন। এরপর তিনি পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেন ও তাঁর বংশধররা আরো পঞ্চাশ বছর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

সাহিত্য ও ভাস্কর্য ঃ লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় অনেক বড় বড় কবি ও পণ্ডিতদের সমাবেশ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে গোবর্ধন, শরণ, উমাপতি-ধর, ধোয়ী ও জয়দেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোবর্ধনের 'আর্য সপ্তশতী' নামে কাব্যগ্রন্থ ভারতের সর্বত্র সমাদর লাভ করেছিল। কবি দুরূহ অথচ দ্রুত তালে শ্লোক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উমাপতিধর সুন্দর সুন্দর ছন্দোবদ্ধ কবিতা লিখতে বিশেষ পটু ছিলেন। কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে 'পবনদূত' নামে একখানি কাব্য রচনা করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। জয়দেব ছিলেন সেনযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা

অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোকেরা এই মধুর গীতি-কাব্যখানি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পড়েন। জয়দেব জন্মেছিলেন বীরভূম জেলার অজয় নদের ধারে কেন্দুবিল্ব গ্রামে। আজও মাঘী সংক্রান্তিতে তাঁর জন্মতিথি উপলক্ষে প্রতি বছর সেখানে একটি মেলা বসে। জয়দেব সম্বন্ধে নানা কাহিনী উত্তর ভারতে প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে তিনি পদ্মাবতী নামে এক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেন। জয়দেব গীত-গোবিন্দের পদগুলি গুন গুন করে গাইতেন এবং পদ্মাবতী এই গানের সঙ্গে নাচতেন। জয়দেব ছিলেন মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের আদর্শ। লক্ষ্মণসেন নিজেও পরম বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কবি ধোয়ী তাঁকে বাংলাদেশের বিক্রমাদিত্য বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর রচিত কয়েকটি শ্লোক পাওয়া গেছে।



সেনযুগের ভাস্কর্য

সেনযুগে নির্মিত সুন্দর সুন্দর দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। কয়েকখানি পুঁথিপত্র পাওয়া গেছে যাতে কতগুলি মনোরম চিত্র আছে। এ থেকে মোটামুটি বোঝা যায় যে সেনযুগেও বঙ্গদেশের ভাস্কর্য ও চিত্রকলার উন্নতি অব্যাহত ছিল।

হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঃ সেনবংশের রাজারা ছিলেন হিন্দু। বিজয়সেন ও বল্লালসেন শিবের ভক্ত ছিলেন আর লক্ষ্মণসেন ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। তাই সেনযুগে শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই ধর্মের বিশেষ সমাদর ছিল।

পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের ওপর বেশী জোর দিয়েছিলেন বলে তাঁদের সময় বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল। কিন্তু সেনরাজাদের উৎসাহে হিন্দুধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করে। বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে এখন যে সকল ধর্মকর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান দেখা যায় সেনযুগেই সেগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্ম ক্রমে লোপ পেতে থাকে।

বল্লালসেন বোধ হয় বৌদ্ধদের বিশেষ পছন্দ করতেন না। তাঁর গুরু এবং পুরোহিত ছিলেন মহামহোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ। বল্লালসেন তাঁর কাছে বেদ, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। তারপর বল্লালসেন হিন্দুদের সদাসর্বদা ব্যবহারের জন্য 'আচারসাগর', 'প্রতিষ্ঠাসাগর, 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে চারখানি বই লেখেন। এর মধ্যে শেষের বই দুখানি মাত্র পাওয়া গেছে। এই বইগুলিতে হিন্দুদের উপযোগী আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন রকমের দান-ধ্যানের ফল এবং তিথিনক্ষত্র ও শুভদিনের বিস্তৃত আলোচনা আছে। বল্লালসেন তাঁর 'অদ্ভুতসাগর' সমাপ্ত করার আগেই বানপ্রস্থে যান। এই গ্রন্থখানি শেষ করেন লক্ষ্মণসেন।

লক্ষ্মণসেনের গুরু ছিলেন মহাপণ্ডিত হলায়ুধ। সেনযুগের তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রকার। তিনি 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্বস্ব', 'শৈবসর্বস্ব' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে তিনি যে সফল হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। শোনা যায়, তখনকার বাঙালী ব্রাহ্মণরা কেউ বেদ পাঠ করতেন না। এমন কি বেদের আচার-অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও তাঁদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বাংলাদেশের মানুষেরা যাতে বেদের

আচার-অনুষ্ঠান বুঝতে পারে সেইজন্য হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব' নামে গ্রন্থখানি রচনা করেন।

সমাজ সংস্কার ঃ ভারতবর্ষের সর্বত্র হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা দেখা দেয়। প্রাচীন কালে বাংলাদেশেও ঠিক এই রকমই ছিল। প্রত্যেক জাতির লোক তাদের নিজ নিজ কুলের নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করতে পারত না। নিজ নিজ জাতিদের মধ্যে ছাড়া কেউ অন্য কোন জাতির লোকদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত না। এমন কি উচ্চশ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়াও করতে পারত না। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে জাতি-ভেদের এত কড়াকড়ি ছিল না। তাই পালযুগে বৌদ্ধদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে হিন্দুদের সমাজ-ব্যবস্থা কিছুটা ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু পরম হিন্দু বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন এবং হলায়ুধের চেষ্টায় হিন্দুসমাজে আবার শৃঙ্খলা ফিরে আসে। বিশেষ করে কুলের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্য বল্লালসেন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার প্রচলন করেছিলেন। কুলে-শীলে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যাঁদের চরিত্র ও আচার-ব্যবহারে কোনও দোষ-ত্রুটি দেখা যেত না, বল্লালসেন তাঁদেরই কুলীন বলে মেনে নিয়েছিলেন। কাজেই কুলীনদের আচার-ব্যবহার. খাওয়া-দাওয়া ও বিবাহের ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হত। কেউ যদি সেরকম মেনে না চলত তাহলে তাকে সমাজ থেকে ঘৃণাভরে দূরে সরিয়ে রাখা হত আর তার কৌলীন্যও কেড়ে নেওয়া হত।

যদিও বল্লালসেন গুণীর আদর এবং সৎভাবে জীবন-যাপনের জন্য কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন করেছিলেন, তথাপি এর ফল ভাল হয়নি। পরবর্তীকালে কুলীনের ছেলে কুলীন হয়েই জন্মাত, তাকে আর কষ্ট করে জ্ঞানী-গুণী হতে হতো না; অথবা কৌলীন্য রক্ষা করবার জন্য কোন চেষ্টা করবারও দরকার হত না। কাজেই এই সমাজ-ব্যবস্থাতে অনেক দোষ-ত্রুটি এসে পড়ে। যেমন সমান ঘরের পাত্র না হলে লীন মেয়েদের বিবাহ হত না; ফলে অবিবাহিত থাকা অপেক্ষা

বৃদ্ধ কুলীনের সঙ্গে মেয়েদের বিবাহ হত; আবার কুলীন বৃদ্ধ একশোর বেশী বিবাহ করতে পারত, কারণ তখন পুরুষদের মধ্যে বহুবিবাহের চলন ছিল। ছোটবেলায় বিবাহ হবার জন্য বালবিধবার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। এইসব দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও একথা মানতে হবে যে সেনরাজাদের আমলে বাংলাদেশে হিন্দুধর্মে সমাজব্যবস্থা সঠিকভাবে প্রচলিত হয়েছিল। তাছাড়া সেনরাজারা মুসলমান আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালীর শক্তি ও সম্মান দুই-ই বজায় রাখতে পেরেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা

শশাঙ্ক যখন গৌড়ের রাজা তখন আরবদেশে মহম্মদ নামে একজন মহাপুরুষ ইস্‌লাম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলতেন, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। অন্য কোন দেবদেবী নেই। মহম্মদ মূর্তি-পূজা ও জাতিভেদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধর্ম যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বলা হত মুসলমান।

তারপর অনেকদিন চলে যায়। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষ দিকে আফগানীস্থানের শাসনকর্তা মহম্মদ ঘোরী প্রায় সমস্ত উত্তর ভারত জয় করেন। দিল্লী ও আজমীরের রাজা পৃথ্বীরাজ, কান্যকুব্জ ও কাশীর রাজা জয়চন্দ্র প্রভৃতি অনেক বড় বড় রাজপুত রাজা মহম্মদ ঘোরীকে বাধা দেবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন। মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যে সকল দুঃসাহসী যুবক এদেশে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহম্মদ বিন্ বখ্‌তীয়ার খল্‌জী। তিনি সৈন্যসামন্ত যোগাড় করে বাংলাদেশ জয় করেছিলেন। বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে মুসলমানদের লেখা ইতিহাসে একটি কাহিনী আছে। বখ্‌তীয়ার প্রথমে মগধ জয় করেন। তারপরে বিহার প্রদেশে মুঙ্গেরের কাছে যে পথ দিয়ে সকলে সচরাচর বাংলাদেশে যাতায়াত করত সে পথে না এসে তিনি বনজঙ্গল ঘুরে একটি নতুন পথে বাংলাদেশে এসে হাজির হন। তারপর একদিন মাত্র আঠারজন ঘোড়সওয়ার নিয়ে হঠাৎ নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সৈন্যরা একটু পিছিয়ে পড়েছিল। নবদ্বীপের লোকেরা ভাবল যে এরা ঘোড়া বিক্রি করবার জন্য শহরে এসেছে। তাই কোন কিছু সন্দেহ না করে শহররক্ষীরা বখ্‌তীয়ার ও তাঁর সঙ্গীদের

শহরে ঢুকবার অনুমতি দিল। এই সুযোগে তারা রাজপ্রাসাদের রক্ষীদের মেরে ভেতরে প্রবেশ করল। ইতিমধ্যে বখ্‌তীয়ারের বাকী সৈন্যও পৌছে গেছে। তখন শহরের ও রাজপ্রাসাদের মধ্যে লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড সুরু হয়ে যায়। দুপুরবেলা, লক্ষ্মণসেন নাকি খেতে বসেছিলেন। তিনি গণ্ডগোলের কারণ জানতে পেরে প্রাসাদের খিড়কী দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং নৌকায় চড়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান।

দ্বিতীয় পাঠ

সুলতানী আমলে বাংলাদেশ

ইলিয়াস্ শাহ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঃ ভারতে মুসলমান রাজাদের রাজধানী ছিল দিল্লীতে আর তাদের উপাধি ছিল সুলতান। বখ্‌তীয়ার খল্‌জীর সময় থেকে প্রায় দেড়শ বছর বঙ্গদেশ দিল্লীর সুলতানের অধীন ছিল। বাংলাদেশ থেকে দিল্লী অনেক দূর। তাই দিল্লীর সুলতানদের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়লেই বাংলার শাসনকর্তারা স্বাধীনতা লাভের আশায় বিদ্রোহ করতেন। এইভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সামস্‌উদ্দিন ইলিয়াস্ শাহ সমগ্র বাংলার স্বাধীন সুলতান হন। তিনি ও তাঁর বংশধরেরা প্রায় সত্তর বছর ধরে বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন।

বাংলার স্বাধীন সুলতানদের ক্ষমতা সাধারণতঃ বড় বড় শহর ও তার আশেপাশে সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামাঞ্চলের হিন্দু জমিদারগণ সুলতানের অধীনতা মেনে নিলেও প্রায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ এলাকায় কর্তৃত্ব করতেন।

বাংলার সুলতানদের মধ্যে যাঁরা একটু শক্তিশালী ছিলেন তাঁরা প্রায়ই বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি জয় করবার চেষ্টা করতেন। কেউ কেউ সফলও হন। আবার কোন শক্তিশালী প্রতিবেশী রাজা

আক্রমণ করলে দুর্বল সুলতানরা কর দিতে স্বীকার করতেন। সুলতানদের মধ্যে অনেকে বিদ্যার সমাদর করতে জানতেন। কেউ কেউ মস্‌জিদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। কয়েকজন সুলতান হিন্দুদের প্রতিও ভাল ব্যবহার করতেন। এই সময় হিন্দুরা সুলতানের অধীনে বড় বড় চাকুরী লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইলিয়াস্ শাহ ও তাঁর পুত্রের শাসনকালে দিল্লীর সুলতান ফিরুজ তুঘলক দুইবার বাংলা জয় করবার চেষ্টা করেন। ইলিয়াস্ শাহকে দমন করবার জন্য ফিরুজ বহু সৈন্যসামন্ত সঙ্গে করে বাংলাদেশে আসেন। তখন আত্মরক্ষার জন্য ইলিয়াস্ শাহ মালদহ জিলার পাণ্ডুয়ার নিকট একডালা দুর্গে আশ্রয় নেন। এই সময় বাংলার হিন্দু ও মুসলমান একত্র হয়ে আক্রমণকারীকে বাধা দিয়েছিল। মাঝে মাঝে দুপক্ষের মধ্যে ছোটখাট যুদ্ধ হত। ফিরুজ কয়েকবার যুদ্ধে জয়লাভও করেছিলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তিনি একডালা দুর্গ দখল করতে পারলেন না। শেষে বর্ষাকাল এসে পড়ায় ফিরুজকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়। দ্বিতীয়বার আক্রমণের সময়ও প্রায় এই রকম ঘটনা ঘটে।

ইলিয়াস্ শাহ পরাক্রমশালী সুলতান ছিলেন। তিনি বারাণসী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। উড়িষ্যা এবং ত্রিহুত থেকেও তিনি কর আদায় করতেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রজারা সুখ ও শান্তিতে বাস করত।

গিয়াস্‌উদ্দীন আজম ঃ সামস্‌উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহের পৌত্র গিয়াস্‌উদ্দীন আজম তাঁর বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তিনি পিতাকে যুদ্ধে নিহত করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। কিন্তু তা হলেও তিনি ধর্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ শাসক বলে খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। সুলতানের অসাবধানতাবশতঃ তাঁর হাতে একজন গরিব বিধবার পুত্র নিহত হয়। বিধবা তখন কাজীর নিকট নালিশ জানালে তিনি বিচারের জন্য সুলতানকে তলব করেন। কাজী

সুলতানকে দোষী সাব্যস্ত করায় তাঁকে প্রচুর অর্থদণ্ড দিতে হয়। এইরূপ সুবিচারে সুলতান কাজীর উপর খুবই সন্তুষ্ট হন ও তাঁকে পুরস্কৃত করেন। সুলতান কাজীকে একথাও বলেছিলেন যে কাজী যদি এরূপ বিচার না করতেন তাহলে তিনি তাঁর মাথা নিতেন।

গিয়াস্‌উদ্দীনের সভায় চীনদেশের সম্রাট একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। সুলতানও চীনদেশে দূত পাঠান। তখনকার চীনদেশের একজন লেখকের বই থেকে জানা যায় যে এই সময় বাংলাদেশে বহু চিকিৎসক, ব্যবসায়ী, জ্যোতিষী, শিল্পী ও পণ্ডিতদের বাস ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিদেশে মাল বোঝাই জাহাজ পাঠান হত। বাঙালীরা অতিথিদের খুব যত্ন করতেন। তাছাড়া এই লেখক বাঙালীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, বাংলার মস্‌লিন নামে সূক্ষ্মবস্ত্র ও কারুশিল্পের খুব প্রশংসা করেছিলেন। গিয়াস্‌উদ্দীন সুকবি ছিলেন। ইরানদেশের বিখ্যাত কবি হাফেজকে তাঁর সভায় আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু হাফেজের আসা সম্ভব হল না বলে তিনি একটি সুন্দর গজল লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

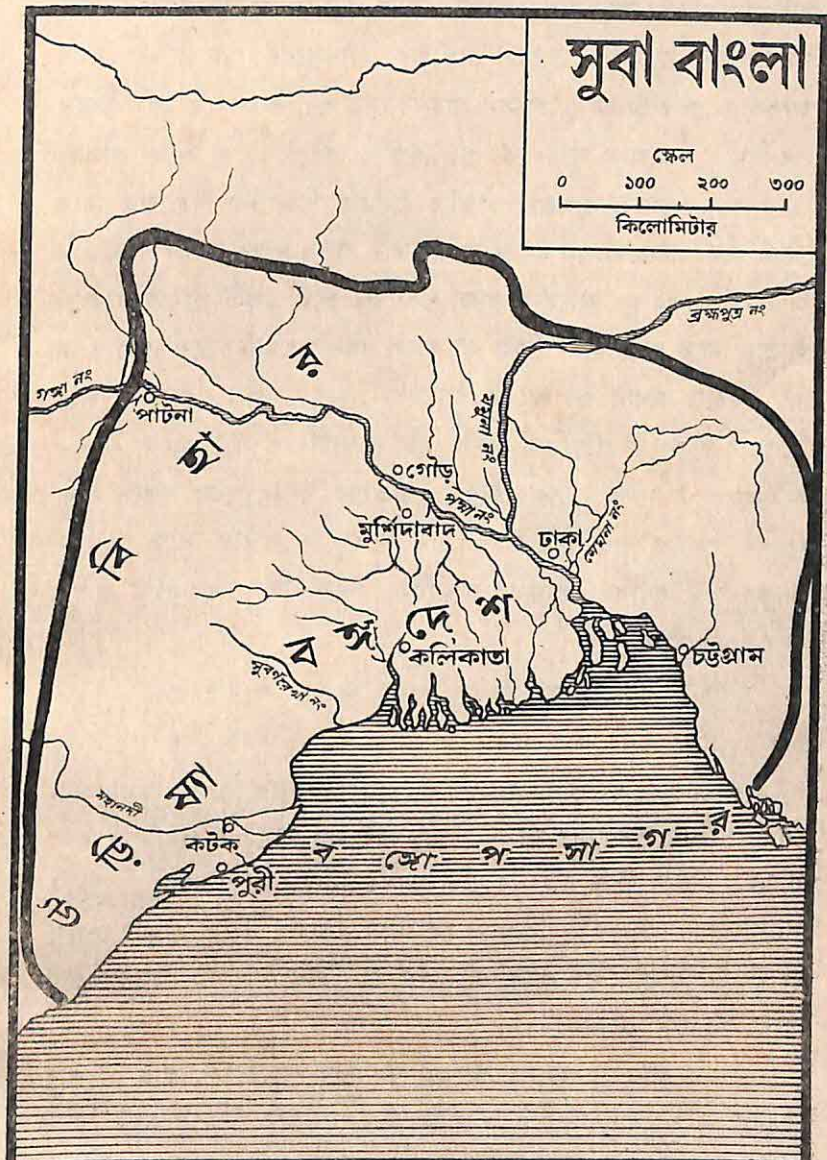
রাজা গণেশ ঃ গিয়াস্‌উদ্দীন আজমের মৃত্যুর কিছুকাল পরে উত্তর বঙ্গে গণেশ নামে একজন হিন্দু জমিদার খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি গিয়াস্‌উদ্দীনের পৌত্রকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। দনুজমর্দন নামে একজন রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা বাংলাদেশের নানাস্থানে পাওয়া গেছে। অনেকে বলেন, গণেশই রাজা হয়ে দনুজমর্দন নাম গ্রহণ করেছিলেন। রাজা গণেশ মাত্র সাত বছর রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র যদু সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে জালালউদ্দীন মহম্মদ নামে পরিচিত হন। রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরগণ চল্লিশ বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন। তারপর ইলিয়াস্‌ শাহের বংশধরগণ বাংলার রাজত্ব ফিরে পায়।

বাংলার দুর্দশা ঃ এই সময় থেকে অনেক বছর পর্যন্ত বাংলাদেশে

আর তেমন কোনও ক্ষমতাশালী সুলতান রাজত্ব করেননি। সুলতান-দের রাজত্বকালে আরব, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া প্রভৃতি জায়গা থেকে এসে বহু মুসলমান ভারতবর্ষে বসবাস করছিল। এদের অনেকে বাংলা-দেশে আসে এবং বড় বড় রাজপদ দখল করে। ইলিয়াস্ শাহের বংশের একজন সুলতানের অনেক হাবসী (আফ্রিকার আবিসিনিয়ার অধিবাসী) ক্রীতদাস ছিল। তারা সুলতানের দেহরক্ষী হিসাবে এবং প্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল। সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা ক্রমে বাংলাদেশে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। এমনকি এদের কেউ কেউ নিজেদের সুলতান বলে ঘোষণা করেছিল। শেষে এদের অত্যাচারে হিন্দু-মুসলমান সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তখন আমীর-ওমরাহরা বিদ্রোহী হয়ে আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে সুলতান বলে ঘোষণা করলেন।

হোসেন শাহ ঃ বাংলার সুলতানদের মধ্যে হোসেন শাহ সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেছেন। মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ আরব দেশের মক্কা শহরে সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হোসেন শাহ এই বংশেরই সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা সর্বপ্রথম বাংলাদেশে এসে একজন কাজীর আশ্রয়ে বাস করতেন। কাজী তাঁর বংশ পরিচয় পেয়ে নিজের কন্যার সঙ্গে হোসেনের বিবাহ দেন। এরপর হোসেন বাংলার সুলতানের অধীনে চাকরী নেন এবং নিজের গুণে ক্রমে উজীরের পদ লাভ করেন। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও দক্ষতার জন্য রাজ্যের আমীর-ওমরাহরা তাঁকে সুলতানের পদে নির্বাচিত করেন। তিনি ও তাঁর বংশধররা বাংলাদেশে প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

হোসেন শাহ প্রথমেই বাংলাদেশ থেকে হাবসীদের তাড়িয়ে দিলেন। তখন বাংলাদেশে আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। বাংলাদেশে যখন গণ্ডগোল চলছিল তখন বাংলার সুলতানদের অধীনস্থ অনেক স্থান প্রতিবেশী রাজারা জয় করে নিয়েছিলেন। রাজ্যের মধ্যে শান্তি ফিরে আসবার পর হোসেন শাহ রাজ্যবিস্তারে মন দেন।


সুবা বাংলা
স্কেল
0 ১০০ ২০০ ৩০০
কিলোমিটার
ব্রহ্মপুত্র নং
গঙ্গা নং
পাটনা
গৌড়
পদ্মা নং
মুর্শিদাবাদ
ঢাকা
মেঘনা নং
কলিকাতা
চট্টগ্রাম
সুবর্ণরেখা নং
কটক
পুরী
ব ঙ্গো প সা গ র

উড়িষ্যা আক্রমণ করে তিনি গৌড় থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল পুনরধিকার করেন। উত্তর প্রদেশের জৌনপুরের সুলতানেরা মগধ অধিকার করেছিলেন ; হোসেন শাহ তাদের পরাজিত করে মগধ উদ্ধার করলেন। বাংলার পূর্বদিকে রাজ্যবিস্তার করতে গিয়ে তিনি কাম্‌তা (কুচবিহার অঞ্চল), কামরূপ প্রভৃতি রাজ্যের রাজাদের পরাজিত করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন। তারপর তিনি আহোমদের অধিকৃত আসাম আক্রমণ করেন। আহোম রাজা পরাজিত হয়ে একটি পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। কিন্তু বর্ষাকালে যখন পথঘাট ভেসে গেল তখন এই বিজিত অঞ্চল সুলতানের হাতছাড়া হয়ে গেল। হোসেন শাহ ত্রিপুরার রাজাকে পরাজিত করে এই রাজ্যটিরও কিছু অংশ নিজের অধিকারে আনতে পেরেছিলেন। একবার জৌনপুরের সুলতানকে আশ্রয় দেবার জন্য দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদীর সঙ্গে হোসেন শাহের যুদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু সিকন্দর সন্ধি স্থাপন করে ফিরে যান।

হোসেন শাহ প্রায় তিরিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি অত্যাচারী ও দুষ্টের দমন করে বাংলাদেশে শান্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রাজ্যের যে সকল স্থান প্রতিবেশী রাজারা দখল করে নিয়েছিলেন সেগুলি তিনি পুনরুদ্ধার করেন। শুধু তাই নয়, উত্তর ও পূর্বদিকে অন্য রাজ্য জয় করে তিনি রাজ্যের সীমা আরও বিস্তৃত করেছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি বাংলার সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

নসরৎ শাহ : হোসেন শাহের পর তাঁর পুত্র নসরৎ শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হিসাবে তিনি পিতার মতই উদার ও সুদক্ষ ছিলেন। তিনি হিন্দুরাজ্য ত্রিহুত (উত্তর বিহার) জয় করেছিলেন। এই সময় দিল্লীর পাঠান সুলতান ইব্রাহিম লোদী মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। তখন বহু

সম্ভ্রান্ত পাঠান বংশীয় লোকজন নসরৎ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা আবার দিল্লী জয় করবার চেষ্টা করেন। সেইজন্য বাবর বাংলাদেশ আক্রমণের উদ্যোগ করছিলেন। এই খবর পেয়ে নসরৎ শাহ বহু উৎকৃষ্ট উপহার সঙ্গে দিয়ে বাবরের নিকট দূত পাঠান। তখন দু'পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয় এবং স্থির হয় যে নসরৎ শাহ পাঠানদের কোনরকম সাহায্য করবেন না। পিতার মত তিনিও আসাম জয় করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি। হোসেন শাহ এবং নসরৎ শাহ দুজনেই খুব উদার চরিত্রের শাসক ছিলেন। তাঁরা হিন্দুদের বড় বড় চাকরী দিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁরা হিন্দু লেখকদের উৎসাহ দিতেন। এই সময় কয়েকটি সুদৃশ্য মস্‌জিদ নির্মিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে গৌড়ের বিখ্যাত সোনা মস্‌জিদ ও কদম রসুল মস্‌জিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজপ্রাসাদের একজন খোজার হাতে নসরৎ শাহের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার কয়েক বৎসরের মধ্যে উত্তর ভারতের অধিকার নিয়ে পাঠান ও মুঘলদের মধ্যে দারুণ সংঘর্ষ হয়। প্রথমে বিহারের শাসনকর্তা শের খাঁর (পরে যাঁর নাম হয় শের শাহ) নেতৃত্বে পাঠানদের জয় হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর দশ বছরের মধ্যে মুঘলরা আবার ভারতবর্ষে প্রাধান্য লাভ করে। বাবরের পৌত্র আকবর বাংলাদেশ জয় করে সুলতানী রাজত্বের অবসান ঘটান।

সাহিত্যচর্চা : আমরা এর আগে দেখেছি, বাংলাদেশে যে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিল তাকে ভেঙেচুরে বাংলাভাষার গোড়াপত্তন হয়েছিল। সুলতানী যুগে খাঁটি বাংলাভাষায় বই লেখা হয়। বাঙালীরা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ পড়তে ভালবাসত। সুলতানী যুগেই সর্বপ্রথম বাংলা রামায়ণ রচিত হয়েছিল, রচনা করেছিলেন স্বনামধন্য কৃত্তিবাস ওঝা। সংস্কৃত থেকে মহাভারতের প্রথম অনুবাদ হয় এই সময়। যাঁরা এই অনুবাদ করেছিলেন তাঁদের উৎসাহ দিয়েছিলেন হোসেনশাহ ও নসরৎ শাহের আমলের দুজন মুসলমান কর্মচারী। শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী নিয়েও বই লিখেছিলেন

মালাধর বসু। তাঁর লেখায় মুগ্ধ হয়ে হোসেন শাহ তাঁকে 'গুণরাজ' উপাধি দেন।

তখন আমাদের দেবী মনসার পূজার খুব প্রচলন হয়েছিল। তাঁকে উদ্দেশ্য করে 'মনসামঙ্গল' নাম দিয়ে দু'খানি বই লেখা হয়। এই বইগুলি থেকে চাঁদ সদাগর, লখীন্দর ও বেহুলার কথা জানতে পারি। আবার দেবী মঙ্গলচণ্ডীর কাহিনী নিয়ে বই লেখেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম। এতে আছে ধনপতি ও শ্রীমন্ত সদাগর এবং কালকেতু ও ফুল্লরার উপাখ্যান। এই বইটি থেকে আমরা সে যুগের বাঙালীদের জীবনযাত্রার একটি সুন্দর চিত্র পাই।

সুলতানী যুগের সাহিত্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টি বৈষ্ণব পদাবলী। এর সূচনা করেন মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি এবং বাংলার কবি চণ্ডীদাস। তাঁদের পদাবলীর কোন তুলনা হয় না। আজও এঁদের লেখা পদগুলি পড়ে মুগ্ধ হতে হয়। শোনা যায়, শ্রীচৈতন্য চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনতে ভালবাসতেন। শ্রীচৈতন্যের দেহাবসানের পর তাঁর জীবনী ও বাণী অবলম্বন করে এক বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্য গড়ে উঠেছিল।

সুলতানীযুগে বাংলাভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতেরও চর্চা হত। বাংলাদেশে নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃত শিক্ষার সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। এখানে অনেক স্বনামধন্য অধ্যাপকরা অধ্যাপনা করতেন। এঁদের মধ্যে শাস্ত্রকার রঘুনন্দন এবং ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা দুজনেই শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন।

সমাজ ও সমাজ সংস্কার ঃ মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বাংলাদেশের সমাজ-ব্যবস্থায় নানারকমের পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। মুসলমান আক্রমণকারীদের শুধু রাজ্যজয়ই উদ্দেশ্য ছিল না। ইসলাম ধর্মের যাতে প্রসার হয় সেদিকেও তাদের প্রখর দৃষ্টি ছিল। তাই তারা প্রথমদিকে অনেক হিন্দুকে জোর করে মুসলমান করেছিল। আবার অনেকে ইচ্ছা করেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।

হিন্দুসমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকদের কোন মর্যাদা ছিল না। সময় সময় তাদের উপর অন্যায় উপদ্রব ও অত্যাচার করা হত। মুসলমান সমাজে কোন জাতিভেদ ছিল না। তাদের মধ্যে কাউকেই উঁচু বা নীচু মনে করা হত না। তাই তখন বহু নিম্নজাতির লোক নিজেদের ইচ্ছায় মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। অনেকে আবার মুসলমানদের অধীনে চাকরি পাবার লোভে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এইভাবে বাংলাদেশে একটি পৃথক মুসলমান সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

এই সকল কারণে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিল। তারা তাদের নিজস্ব ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হল। জাতিভেদের কড়াকড়ি আরও কঠোর হয়ে উঠল। কোন মুসলমান হিন্দুর বাড়িতে প্রবেশ করতে পারত না। এমন কি যাদের জোর করে মুসলমান করা হত তাদের পরিবার-পরিজনকে সমাজে পতিত করে রাখা হত। ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে যেতেই থাকে। এই সময় মেয়েদের বাল্যবিবাহের আরও প্রসার ঘটে। কেউ যদি বিধবা হত তাকে একরকম জোর করে মৃতস্বামীর সঙ্গে এক চিতায় পুড়িয়ে মারা হত।

বল্লালসেন বাংলাদেশে যে কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন করেছিলেন তা সব সময় কড়াকড়িভাবে মেনে চলা হত না। তাই কুলীনদের মধ্যে অনেক দোষত্রুটি দেখা দেয়। এইজন্য দেবীবর নামে তখনকার একজন বিখ্যাত সমাজপতি ব্রাহ্মণদের ছত্রিশটি পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ করে কে কোন ঘরে বিবাহ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে মিলিত হতে পারবেন তা ঠিক করে দেন। হোসেন শাহের অমাত্য পুরন্দর খাঁ কায়স্থ সমাজের নানা সংস্কার সাধন করেন। কিন্তু রঘুনন্দন হিন্দুদের সকল রকম আচার-ব্যবহার, নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অশৌচ পালনের রীতিনীতি কঠোরভাবে বেঁধে দিয়েছিলেন। আজও বাংলাদেশের গোঁড়া হিন্দুরা তাঁরই নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে চলেছে।

শ্রীচৈতন্যদেব ঃ হোসেন শাহের সময়ে সবচেয়ে বড় ঘটনা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। তাঁর জন্ম হয়েছিল নবদ্বীপে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা দোলের দিন। তাঁর পিতার নাম ছিল জগন্নাথ মিশ্র, মাতা ছিলেন শচীদেবী। তিনি দেখতে ছিলেন অপূর্ব সুন্দর, দেহের বর্ণ ছিল সোনার মত। তাই নবদ্বীপের অধিবাসীরা আদর করে তাঁর নাম দিয়েছিলেন গোরা, গৌরচন্দ্র এবং গৌরাঙ্গ। চৈতন্য খুব মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। টোলে পড়াশুনা করে নানা শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ হয়। তাঁর গভীর জ্ঞানের কাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় কেশব নামে কাশ্মীরের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত নবদ্বীপে এসে তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। চৈতন্যদেব সহজেই তাঁকে পরাস্ত করেন।

গয়াতে পিতৃপুরুষের পিণ্ড দিতে গিয়ে তাঁর মনে গভীর ধর্মভাব জেগে ওঠে। সেখানে ঈশ্বরপুরী নামে এক সন্ন্যাসীর নিকট তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন। এরপরে তিনি নবদ্বীপে ফিরে আসেন ; কিন্তু সংসারের কোন কাজে তাঁর মন বসল না। তিনি হরিনাম নিয়েই মেতে রইলেন। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি কেশব ভারতী নামে এক সন্ন্যাসীর নিকট যথারীতি সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা নেন। তাঁর বাকী জীবনের ছ'বছর কেটেছিল ভারতবর্ষের তীর্থ-দর্শনে, আর আঠার বছর পুরীতে। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই হরিনাম প্রচার করতেন এবং তাঁর মুখে নামগান শুনে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেত। তিনি পুরীতেই দেহরক্ষা করেন। মাত্র আটচল্লিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম প্রচার ঃ চৈতন্যদেব বাংলাদেশে প্রেমের ধর্মপ্রচার করে ভগবৎ-ভক্তির বান ডেকে এনেছিলেন। তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা শহরে শহরে কীর্তন করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। তিনি বলতেন, প্রেম ও ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে সহজে লাভ করা যায়। তাই রাধাকৃষ্ণের নাম কীর্তন ও নামজপই ছিল চৈতন্যদেবের ধর্মের প্রধান কথা। সকল জীবের প্রতি দয়া করবার কথা তিনি বারবার বলতেন। তাঁর কাছে উচ্চ বা নীচ ছিল না ; হিন্দু-মুসলমানেও তিনি কোন

প্রভেদ করতেন না। তিনি বলতেন, জাতিভেদ বলে কিছু নেই, সকল জাতি ঈশ্বরের চোখে সমান। কিন্তু হিন্দুদের গোঁড়ামি ও জাতিভেদ যে সকলে পছন্দ করতেন তা নয়। বাংলাদেশে এর বিরুদ্ধে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবই সর্বপ্রথম আন্দোলন শুরু করেন। চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্যের নাম ছিল নিত্যানন্দ। তাঁর একজন মুসলমান শিষ্যও ছিলেন। পরে তিনি যবন হরিদাস নামে পরিচিত। এর পরে প্রচলিত পূজার আচার-অনুষ্ঠানের চাইতে শ্রীকৃষ্ণের নাম-গান ও কীর্তনের সহজ ভাবটি সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর ফলে সমস্ত বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে মণিপুর, উড়িষ্যা, বৃন্দাবন প্রভৃতি অঞ্চলে মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রদেব চৈতন্যদেবের একজন বড় ভক্ত ছিলেন।

ধর্মবিষয়ে সহনশীলতা ঃ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মবিষয়ে এত মতপার্থক্য ছিল যে এই দুই সম্প্রদায়ের পূর্ণ মিলন অসম্ভব ছিল। হোসেন শাহের মত সুলতানও উড়িষ্যা আক্রমণ করে হিন্দুদের দেব-দেবীর মন্দির ভেঙে ফেলেছিলেন। কাজীরা যে হিন্দুদের প্রতি অবিচার করতেন তারও প্রমাণ আছে। আবার হিন্দুরাও মুসলমানদের স্পর্শ পর্যন্ত অপবিত্র মনে করত। তাহলেও প্রথম দিকের জয়-পরাজয় ও অরাজকতার যুগ শেষ হবার পর যখন মুসলমান শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছুটা সম্প্রীতি স্থাপিত হয়। হোসেন শাহ এবং নসরৎ শাহ যে বাঙ্গালী হিন্দু লেখকদের উৎসাহ দিতেন সেকথা এর আগে বলা হয়েছে। হোসেন শাহ কয়েকজন গুণী হিন্দুকে বড় বড় রাজকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি রাঢ়দেশের গোপীনাথ বসুকে পুরন্দর খাঁ উপাধি দিয়ে অমাত্যের পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের শিষ্যরূপ ছিলেন সুলতানের দবীর খান অর্থাৎ একান্ত সচিব ; তাঁর ভাই সনাতন ছিলেন রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্মচারী। এছাড়া আমরা আরও দেখতে পাই যে সে যুগের কোন কোন মুসলমান লেখক তাঁদের গ্রন্থের আরম্ভে হিন্দু দেবদেবীর

বন্দনা করেছেন, হিন্দু লেখকদের মধ্যেও কয়েকজন বন্দনা করেছেন হজরত মহম্মদকে। হিন্দু-মুসলমান উভয়ই মুসলমান পীরদের শ্রদ্ধাভক্তি করত, তাদের উদ্দেশ্যে সিন্নী দিত। মুসলমানদের সত্যপীর হয়েছিলেন হিন্দুদের সত্যনারায়ণ। গ্রাম অঞ্চলের মুসলমানেরা শীতলা, মনসা, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীদের কাছে মানত করত। এইভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে কিছুটা সহনশীলতা এসেছিল।

তবুও একথা বলতেই হবে যে হিন্দুসমাজের আহার ও বিবাহ ব্যাপারে কঠোর আচারনিষ্ঠা এবং সেইসঙ্গে মুসলমানদের হিন্দু মূর্তি-পূজার বিরোধিতার জন্য দীর্ঘ তিনশত বছর একসঙ্গে বসবাস সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের পূর্ণ ঐক্য আনা সম্ভব হয়নি। হিন্দুসমাজ ও মুসলমান সমাজ আজ পর্যন্ত পৃথকই থেকে গিয়েছে।

তৃতীয় পাঠ

মুঘলদের বিরুদ্ধে বাঙালীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভূমিকা ঃ বাবরের পৌত্র আকবর ছিলেন মুঘল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি বড় বড় রাজপুত রাজাদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলেন। বড় বড় মুসলমান সেনাপতি ও রাজপুত রাজাদের সাহায্যে তিনি ভারতবর্ষে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। বাংলাদেশের পাঠান সুলতান দায়ুদকে পরাজিত ক'রে তিনি বাংলা-দেশও জয় করে নিয়েছিলেন। বাঙালীরা কিন্তু সহজেই আকবরের অধীনতা স্বীকার করেনি। সুলতান দায়ুদ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তখন বাংলাদেশে মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা হল।

বারো ভুঁইয়া ঃ বাংলাদেশের জায়গায় জায়গায় অনেক বড় বড় জমিদার ছিল। এইসকল জমিদারদের মধ্যে বারোজন ছিলেন বিশেষ শক্তিশালী। তাঁরা ইতিহাসে বারো ভুঁইয়া নামে পরিচিত। তাঁরা সকলেই আকবরের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মনে মনে আসল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে স্বাধীন হবেন। এঁদের মধ্যে আবার তিনজন ছিলেন খুবই শক্তিশালী। তাঁরা হলেন পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁয়ের ঈশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং যশোহরের প্রতাপাদিত্য। তিনজনেরই বহু সুশিক্ষিত লোক-লস্কর, পাইক-বরকন্দাজ ও সৈন্য-সামন্ত ছিল। তাছাড়া জলপথে শত্রুদের বাধা দেবার জন্য তাঁরা অনেক জাহাজ, বজরা, ছিপ প্রভৃতি রাখতেন। বেগতিক দেখলে যাতে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারেন সেজন্য নিজ নিজ এলাকায় তাঁরা বড় বড় দুর্গও নির্মাণ করেছিলেন। এইভাবে শক্তি সঞ্চয় করে তাঁরা মুঘল বাদশাহকে খাজনা-পত্র দেওয়া বন্ধ করে দেন। তারপর বহু বছর যুদ্ধবিগ্রহ করে মুঘল সেনাপতিরা এদের ক্ষমতা ধ্বংস করতে পেরেছিল।

ঈশা খাঁ ঃ বারো ভুঁইয়াদের সম্বন্ধে বাংলাদেশে অনেক কাহিনী

প্রচলিত আছে। এইসকল কাহিনী থেকে জানা যায় যে, ঈশা খাঁ সুলতান দায়ুদের সেনাপতি ছিলেন। তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে খুব সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। দায়ুদের মৃত্যুর পর বহু পাঠান সৈন্য ঈশা খাঁর নিকট আশ্রয় নেয়। তিনি নিজের বুদ্ধি ও বাহুবলের সাহায্যে একজন প্রধান ভুঁইয়া হ'য়ে উঠেছিলেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা অঞ্চল নিয়ে তাঁর রাজ্য ছিল। ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জের কাছে খিজিরপুরে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন।

ঈশা খাঁর বল ও বুদ্ধির কাছে মুঘল সেনাপতিদের অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছিল। প্রথমে শাহবাজ খাঁ নামে একজন মুঘল সেনাপতি তাঁকে দমন করতে আসেন। শোনা যায়, ঈশা খাঁ সামনা-সামনি যুদ্ধ না করে "নদী-নালার গোলক ধাঁধায়" শাহবাজ খাঁ ও তাঁর সৈন্যদের দিশেহারা করে তুলেছিলেন।

বাংলাদেশ নিয়ে মুঘল বাদশাহ আকবরের চিন্তার অবধি ছিল না। তিনি রাজপুতনার অম্বরের রাজা মানসিংহকে পাঠালেন বাংলার ভুঁইয়াদের দমন করতে। মানসিংহ একজন খুব বড় বীর ও যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বহু সৈন্যসামন্ত এবং জলযুদ্ধের জন্য নানারকম জাহাজ ও সাজ-সরঞ্জাম ছিল। প্রথম যুদ্ধে কিন্তু মানসিংহ ঈশা খাঁকে পরাজিত করতে পারেননি। ঈশা খাঁ তাঁর 'এগার-সিন্ধু' নামে দুর্গে পালিয়ে গেলেন। মানসিংহ তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দুর্গটি অবরোধ করেন। তখন ঈশা খাঁর সৈন্যরা অবাধ্য হ'য়ে যুদ্ধ করতে অসম্মত হয়। ঈশা খাঁ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। মানসিংহ সম্মত হলেন। দুজনেই ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধস্থলে এসে উপস্থিত হন। প্রথম আক্রমণেই মানসিংহের তরবারি ভেঙে গেল। কিন্তু ঈশা খাঁ নিজের তরবারি মানসিংহকে দিলেন। কিন্তু মানসিংহ ঈশা খাঁর সাহস ও উদারতা দেখে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন। আকবর ঈশা খাঁকে ২২টি পরগণার জমিদারী এবং 'মস্‌নদ-ই-আলা' উপাধি দিয়েছিলেন।

কেদার রায়ঃ বিক্রমপুরের ভুঁইয়া রাজা কেদার রায়ের রাজধানী ছিল পদ্মার পারে তারপাশা স্টেশনের কাছে শ্রীপুরে। শোনা যায়, এই রাজধানীটি ছিল নাকি দেখবার মত স্থান। সেখানে ছিল বড় বড়

রাস্তাঘাট, বড় বড় মঠ, বাগান-বাগিচা; কিন্তু আজ তার কোন চিহ্নই নেই; রাক্ষসী পদ্মা সব ধ্বংস করেছে। তাই অনেকে বলেন, কেদারের কীর্তি নষ্ট করে পদ্মার আর এক নাম হয়েছে কীর্তিনাশা।

কেদারের একটি মস্ত বড় রণতরী ছিল। তাছাড়া সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর, দুর্গ প্রভৃতি তো ছিলই। এই সময় বাংলাদেশে মুঘল শাসনকর্তা ছিলেন কুলী খাঁ। কেদার একদিন তাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলেন। বিপদে পড়ে কুলী খাঁ সংবাদ দিলেন মানসিংহকে। তিনি মুণ্ডা রায় নামে একজন দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে হুকুম দিলেন কেদার রায়কে উপযুক্ত শাস্তি দিতে। দু'পক্ষে ভয়ঙ্কর জলযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে মুণ্ডা রায় কেদারের হাতে পরাজিত ও নিহত হলেন। এবার স্বয়ং মানসিংহই কেদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন। তিনি বাংলায় এসে কেদারের কাছে তাঁর তরবারি ও শৃঙ্খল পাঠিয়ে যে কোন একটি বেছে নিতে বললেন। বীর কেদার তরবারি তুলে নিয়ে মানসিংহকে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানালেন। দু'পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল। কেদার পরাজিত হলেও মানসিংহ তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেন। কিন্তু কেদার সন্ধিমত 'কর' না দিয়ে স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে লাগলেন। তখন মানসিংহ দ্বিতীয়বার এসে কেদারকে যুদ্ধে হারিয়ে মেরে ফেললেন। কেদারের রাজ্য মুঘলদের হাতে চলে গেল।

প্রতাপাদিত্য: বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য ছিলেন ক্ষমতা ও বীরত্বে অগ্রগণ্য। এখনকার চব্বিশ পরগণা, যশোহর ও খুলনা জেলার কিছু অংশ নিয়ে ছিল প্রতাপের রাজ্য। তাঁর বাবা শ্রীহরি ও কাকা জানকীবল্লভ সুলতান দায়ুদের অধীনে খুব বড় রাজ-কর্মচারী ছিলেন। সুলতান শ্রীহরিকে 'রাজা বিক্রমাদিত্য' ও জানকী-বল্লভকে 'রাজা বসন্ত রায়' উপাধি দিয়েছিলেন। যশোহর, খুলনা প্রভৃতি স্থান তখন বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় এইসব বনজঙ্গল পরিষ্কার করে যশোহর শহরটি নির্মাণ করেন। দায়ুদের মৃত্যুর পর তাঁরা সেখানে এসে রাজত্ব করতে থাকেন। দু'জনেই আকবরের অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন।

প্রতাপাদিত্য ছিলেন বিক্রমাদিত্যের পুত্র। বাল্যকাল থেকেই প্রতাপ সাহস ও বীরত্বের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কুস্তিতে,

বাতাসের বেগে ঘোড়া ছোটাতে, বন্দুক চালাতে কেউই তাঁর জুড়ী ছিল না। একটু বড় হয়েই প্রতাপ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। একদিন বিক্রমাদিত্য অনেক মূল্যবান উপহার ও খাজনার টাকা দিয়ে প্রতাপাদিত্যকে মুঘল সম্রাটের রাজধানী আগ্রায় পাঠান। সেখানে প্রতাপ আকবরের সুনজরে পড়ে যান। দেশে ফেরবার সময় আকবর প্রতাপকেই যশোহর রাজ্যের সনদ দেন। পিতার জীবিতকালেই তিনি যশোহরের রাজা হন।

তখন বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলে মগ, ফিরিঙ্গি (পর্তুগীজ) প্রভৃতি যথেচ্ছ লুটতরাজ ও হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছিল। প্রতাপ এই সব জলদস্যুদের দমন করেন। তাদের নিয়ে তিনি একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন। তাতে তীরন্দাজ, বরকন্দাজ, গোলন্দাজ, অশ্বারোহী সবরকম সৈন্য ছিল। এছাড়া অনেক নীচু জাতির লোকেরাও সৈন্য-দলে ছিল। রাজ্যের নানাস্থানে তিনি অনেক দুর্গ তৈরী করেছিলেন। কেদার রায়ের মত তিনি একটি রণতরীও প্রস্তুত করেছিলেন। এইভাবে আত্মরক্ষার জন্য সবকিছু প্রস্তুত হ'লে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আকবর প্রতাপের স্পর্ধা ও দুঃসাহস বরদাস্ত করলেন না। তিনি তাঁর বাছাই করা সৈন্য পাঠালেন প্রতাপের গর্ব খর্ব করতে কিন্তু তারা হেরে পালিয়ে যায়। তারপর আর একজন মুঘল সেনাপতি এলেন ; তাঁরও হার হল।

এইসময় আকবরের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর আবার মানসিংহকে বাংলাদেশে পাঠালেন। চতুর ও কুশল মানসিংহের কাছে প্রতাপকে পরাজয় মেনে সন্ধি করতে হল। কিন্তু এরপরেও প্রতাপকে সম্পূর্ণ বশে আনা গেল না। তখন এলেন ইস্‌লাম খাঁ। প্রতাপ প্রাণপণে যুদ্ধ করেও হেরে গেলেন। ইস্‌লাম খাঁ তাঁকে শিকল পরিয়ে লোহার খাঁচায় বন্দী করে, আগ্রায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পথের মাঝে কাশীধামে প্রতাপের মৃত্যু হয়। অবশেষে বাংলাদেশের সর্বত্র মুঘল শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। কিন্তু বাঙালী ভুঁইয়ারা স্বাধীন হবার জন্য যে সাহস ও বীরত্ব দেখিয়েছেন, বাঙালী তা চিরকাল স্মরণ করবে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

মুঘল শাসনাধীনে বাংলাদেশ

মুঘল বাদশাগণ প্রায় দু'শ'বছর বাংলাদেশকে নিজেদের অধীনে রাখতে পেরেছিলেন। তাঁদের রাজত্বের প্রথম দিকে বাংলার লোকদের নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। সর্বত্র যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। কারণ বার ভুঁইয়ারা মুঘলদের অধীনতা কোনদিনই মেনে নিতে পারেননি। তা ছাড়া সুলতান দায়ুদের পাঠান অনুচরেরাও অনেক কাল মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছিল।

বঙ্গদেশে মুঘল রাজত্বের প্রতিষ্ঠাঃ ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বাবর। তিনি সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। বাংলার সুলতান নসরৎ শাহ তাঁর অধীনতা মেনে নেন। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সম্রাট হন। তখন বিহার প্রদেশের শাসনকর্তা শের খাঁ খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড় অধিকার ও লুণ্ঠন করেন। এর ফলে হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব বেধে গেল। শের খাঁ হুমায়ুনকে পরাজিত করে মুঘলদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করেন। তারপর তিনি 'শের শাহ' উপাধি ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি বঙ্গদেশে সুলেমান কররানী নামে একজন নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

শের শাহের মৃত্যুর দশ বছর পরে হুমায়ুন আবার দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তখন দিল্লীর সম্রাট হন আকবর। সুলেমান কররানী তাঁর অধীনতা স্বীকার করে নেন। বাংলার শেষ

সুলতান ছিলেন সুলেমানের পুত্র দায়ুদ। তিনি মুঘলদের অধীনতা অস্বীকার করেন। কিন্তু মুঘল সৈন্যদের হাতে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। তখন বাংলাদেশে সরাসরি মুঘল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

মুঘল যুগে বাংলাদেশের অবস্থা ঃ এদিকে মুঘল রাজত্বের প্রথম যুগে দক্ষিণ বাংলার লোকদের ধন, মান, জীবন বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ব্রহ্মদেশের আরাকান প্রদেশের মগ ও ফিরিঙ্গি (পর্তুগীজ) জলদস্যুদের উৎপাতে দক্ষিণ বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এই জলদস্যুরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে লুটতরাজ চালাত ; যাদের সামনে পেত, হয় তাদের হত্যা করত, নয় তাদের বন্দী করে জাহাজে তুলে অন্য দেশে বিক্রি করত। এমনকি অনেক সময় ছোট ছোট নৌকা করে এসে হাটে বাজারে অথবা বিয়ের আসরে ঢুকে ভীষণ অত্যাচার করত। এদের দমন করতে মুঘল সম্রাটদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

এইভাবে অনেকদিন অরাজকতা চলার পরে বাংলাদেশে আবার সুখ ও শান্তি ফিরে আসে। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হতে থাকে। বাংলাদেশে এত তুলা ও রেশমের কাপড় তৈরী হত যে তাতে সারা ভারতবর্ষের এবং আরও অনেক দেশের অভাব মিটত। ঢাকার মস্‌লিন কাপড় এত সূক্ষ্ম ও মসৃণ ছিল যে তার সুখ্যাতি দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শায়েস্তা খাঁ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর সময় টাকায় আট মণ চাল বিক্রি হত। এতে সাধারণ লোকের দুঃখ কিছুটা ঘুচেছিল। মুঘল আমলেই সর্বপ্রথম ইয়োরোপ থেকে পর্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ, দিনেমার ও ফরাসী জাতির লোকেরা বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছিল।

সম্রাট আকবর যখন দিল্লীর বাদশা ছিলেন তখন তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সুবাতে ভাগ করেছিলেন। এতে শাসন-কার্যের সুবিধা হবে বলে তিনি মনে করতেন। বাংলাও ছিল এইরকম একটি

সুবা। প্রত্যেক সুবাতে দুজন রাজকর্মচারী থাকতেন। একজনের নাম নাজিম বা সুবাদার। তাঁর কাজ ছিল দেশের শান্তি রক্ষা করা, প্রজাদের সুখশান্তি ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা, আর শত্রুর হাত থেকে দেশকে বাঁচানো। অন্য রাজকর্মচারীকে বলা হত দেওয়ান। তিনি প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন এবং বণিকদের কাছ থেকে শুল্ক সংগ্রহ করতেন। সবরকম টাকা-পয়সার হিসাব রাখা এবং সুবেদারের প্রয়োজনমত টাকার জোগাড়ও এই দেওয়ানের করতে হত। বাকী টাকা বাদশাকে দিতে হত। কাজেই সুবেদারের পদ দেওয়ানের চাইতে একটু উঁচু ছিল।

মুর্শিদকুলী খাঁ ঃ মুঘল সম্রাটদের মধ্যে শেষ শক্তিশালী বাদশা ছিলেন ঔরঙ্গজেব। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে তিনি পৌত্র আজীম-উস্-সানকে বাংলার নাজিম নিযুক্ত করেন। এর আগেই মুর্শিদকুলী খাঁ নামে একজন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি সেখানে দেওয়ান ছিলেন। নতুন নাজিমের সঙ্গে দেওয়ানের মোটেই বনিবনা হল না। তখন মুর্শিদকুলী খাঁ রাজধানী ঢাকা থেকে মুক্সুদাবাদে চলে গেলেন।



মুর্শিদকুলী খাঁ।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল বংশধরদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত আজীম-উস্-সানের পুত্র ফরুখশিয়র দিল্লীর সম্রাট হলেন। তিনি সম্রাট হয়েই মুর্শিদকুলী খাঁকে বাংলার নাজিমের পদটি দিয়েছিলেন। এতে মুর্শিদকুলী একাধারে

নাজিম ও দেওয়ানের পদ পেয়ে বাংলাদেশের সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। সেইসময়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি করে মুঘল সম্রাটদের ক্ষমতা খুব কমে গিয়েছিল। তাই মুর্শিদকুলী খাঁ একরকম স্বাধীনভাবেই বাংলার শাসনকার্য চালাতে লাগলেন। তাঁর উপাধি হল নবাব।

আকবরের রাজত্বকালে তাঁর মন্ত্রী টোডরমল বাংলাদেশের কৃষকদের খাজনার হার ঠিক করে দিয়েছিলেন। মুর্শিদকুলী বাংলার জমিদারদের সঙ্গে খাজনাপত্র দেয়া ও নেয়ার একটু ভিন্ন ব্যবস্থা করে নিলেন। বহু হিন্দু নবাব মুর্শিদকুলীর রাজস্ব বিভাগে (যে বিভাগে টাকা-পয়সা আদায় ও ব্যয়ের হিসাব রাখা হয়) কাজ পেল। এই ব্যবস্থার ফলে দিনাজপুর, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে বড় বড় হিন্দু জমিদারীর সৃষ্টি হয়েছিল। তবে জমিদাররা যদি খাজনাপত্র ঠিক মত না দিতেন তবে মুর্শিদকুলী খাঁ তাদের কঠোর শাস্তি দিয়ে কারাগারে পুরে রাখতেন।

মুর্শিদকুলী খাঁর সময় রাজ্যের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল। দেশীয় বণিকদের চাইতে ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশী বণিকগণ যাতে বেশী সুবিধা না পায় সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল।


সুজাউদ্দৌলা

সুজাউদ্দৌলা : মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দৌলা বাংলার নবাব হলেন। বাংলাদেশ ছাড়া তিনি বিহারের নাজিমের পদ পেয়েছিলেন। তাঁর সভায় আলীবর্দী খাঁ নামে একজন বিচক্ষণ রাজকর্মচারী ছিলেন। সুজাউদ্দৌলা নিজের অধীনে তাঁকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। নূতন নবাব ন্যায়বিচারের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন। মুর্শিদকুলী যে

সকল হিন্দু জমিদারদের বন্দী করেছিলেন, সুজাউদ্দৌলা তাঁদের মুক্তি দিলেন। এইজন্য হিন্দুরা তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিল।

সরফরাজ ঃ সুজাউদ্দৌলার পর নবাব হন তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ। তিনি অতি অকর্মণ্য ছিলেন। এদিকে আলীবর্দীর মনে মনে নবাব হবার প্রবল বাসনা ছিল। তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদের বড় বড় আমীর-ওমরাহদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন। তারপর রাজমহলের কাছে (গিরিয়ার) যুদ্ধে সরফরাজকে হত্যা করে বাংলার মসনদ অধিকার করলেন।

আলীবর্দী খাঁ ঃ বিশ্বাসঘাতকতা করে নবাব হলেও আলিবর্দী খাঁ কোনও মতেই অযোগ্য ছিলেন না। তাঁর অনেক গুণ ছিল। যেমন, কি করলে প্রজাদের মঙ্গল হবে তা তিনি জানতেন। তিনি ন্যায়বিচার করতেন। তাছাড়া তিনি সুদক্ষ রণকুশল সেনাপতিও ছিলেন। তিনি দিল্লীর বাদশাহকে উপহার পাঠিয়ে তাঁকে তুষ্ট করে বাংলা ও বিহার ছাড়া উড়িষ্যারও নাজিম হন। এসময়ে বাদশাহের ক্ষমতা এত কমে গিয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত আলীবর্দী খাঁ খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিলেন।

বর্গীর হাঙ্গামা ঃ আলীবর্দীর সময় বাংলাদেশে কয়েকটি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তিনি তা কঠিন হস্তে দমন করেন। তার সময়ের সবচাইতে বড় ঘটনা বাংলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামা। মহারাষ্ট্রের অধিবাসীদের বলা হত মারাঠা। এদের অশ্বারোহী সৈন্যদের নাম ছিল বর্গী। বর্গীরা ঘোড়ায় চড়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বিদ্যুৎগতিতে যেতে পারত। মারাঠারা এই সময় এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিস্তৃত এক অঞ্চল তারা জয় করে নিয়েছিল। তাদের ভয়ে রাজপুত রাজারা সর্বদা শঙ্কিত থাকতেন। দিল্লীর বাদশাহকেই তারা পরোয়া করত না। তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পাবার জন্য মুঘল সম্রাট ও অন্যান্য রাজারা 'চৌথ' নামে একরকম কর দিতেন।

মারাঠারা উড়িষ্যা জয় করে সেখান থেকে অনেক কাল পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বছর বাংলাদেশে এসে হানা দিত। আর মগ ও ফিরিঙ্গিদের মত লুটতরাজ চালাত। পশ্চিমবাংলার বহু গ্রাম তারা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। বহুলোক তাদের হাতে প্রাণ হারায়। বহু নারীর সম্মান নষ্ট হয়। মারাঠা বর্গীরা যে কি রকম আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল তা তখনকার বাংলায় লেখা 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' নামে একখানি পুস্তক থেকে আমরা জানতে পারি। বর্গীর ভয় দেখিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াবার জন্য একটি বাংলা ছড়া আছে তা বোধহয় তোমরা জান।

আলীবর্দী বারবার দেশ থেকে বর্গীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাংলায় ভাস্করপাণ্ডিত নামে এক অসমসাহসী সুদক্ষ যোদ্ধা বর্গীদের নেতা ছিলেন। আলীবর্দী খাঁ তাঁকে কৌশলে হত্যা করেন। তবুও কিছুতেই তিনি এদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না। তখন তিনি মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করেন। চৌথের পরিবর্তে তিনি উড়িষ্যা প্রদেশ তাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন; এরপরে বাংলায় শান্তি ফিরে এসেছিল।

সিরাজউদ্দৌলা ঃ আলীবর্দীর কোনও পুত্র ছিল না। তিনি সিরাজ নামে তাঁর এক দৌহিত্রকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁরই নির্দেশে তাঁর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা বাংলার নবাব হলেন। তখন তাঁর বয়স চব্বিশ বছর। তাঁর কোনও রকম সাংসারিক অভিজ্ঞতা ছিল না। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে যা খুশী তাই তিনি করতেন। এইজন্য রাজ্যের অনেক সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। এর ফলে মাত্র চৌদ্দ মাস রাজত্বের পর তাঁকে সিংহাসন



সিরাজউদ্দৌলা

ও প্রাণ দুই-ই হারাতে হয়েছিল। এইসঙ্গে বাংলাদেশের নবাবদের রাজত্বের চিরতরে অবসান ঘটল। কারণ সুযোগ পেয়ে বণিকের বেশ ছেড়ে চতুর ইংরেজ বাংলাদেশে রাজত্ব করতে শুরু করে দিল।

দ্বিতীয় পাঠ

ইউরোপীয় বণিকদের ভারতে আগমন ও বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত

প্রাচীনকাল থেকে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে সরাসরি ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। মধ্যযুগে যখন সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমানগণ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তখন এই সরাসরি ব্যবসার পথ বন্ধ হয়ে যায়। পশ্চিম ইউরোপের বণিকগণ সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসবার পথ খুঁজতে লাগল। অবশেষে পর্তুগালের নাবিক ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকা ঘুরে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে এসে উপস্থিত হন। এইভাবে ইউরোপ থেকে সরাসরি জলপথে আসবার পথ আবিষ্কৃত হয়।

এর প্রায় একশ বছর পরে ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং দিনেমারগণ একে একে ভারতে আসতে লাগলেন। সবশেষে এলো ফরাসীরা। এরা সকলেই ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য আলাদা করে কোম্পানী গঠন করল। নিজেদের দেশের নাম জুড়ে দিয়ে তারা যেমন নাম রাখল-ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ফ্রেঞ্চ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইত্যাদি।

বাণিজ্যকুঠি স্থাপন: বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্য পর্তুগীজরা হুগলীতে কুঠি স্থাপন করেছিল। ওলন্দাজদেরও কুঠি ছিল চুঁচুড়াতে এবং দিনেমারদের শ্রীরামপুরে। ইংরেজরা কুঠি তৈরী করেছিল পাটনা, কাশিমবাজার, হুগলী এবং ঢাকাতে।

পর্তুগীজরা এসেছিল সকলের আগে, তাই তাদের বেশ কিছু সুবিধা হয়েছিল। আকবরের অনুমতি নিয়ে তারা সর্বপ্রথম বাংলা-দেশের সপ্তগ্রামে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। তারপর হুগলীতে কুঠি তৈরী করে তারা একটি বড় বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলল। হুগলী হয়ে উঠল ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান বন্দর।

কিন্তু পর্তুগীজরা বাংলাদেশে বেশীদিন টিকতে পারেনি। যেসব ব্যবসায়ী হুগলী নদীর পাশ দিয়ে নৌকা নিয়ে যেত তাদের কাছ থেকে তারা বাদশার অনুমতি ছাড়াই শুল্ক আদায় করত। তাছাড়া এরা ছোট ছোট হিন্দু-মুসলমান ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে জোর করে খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করত। জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান যখন দিল্লীর বাদশা হলেন তখন তিনি পর্তুগীজদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর হুকুমে বাংলার শাসনকর্তা হুগলী অবরোধ করলেন। দু'পক্ষের যুদ্ধে বহু পর্তুগীজ হতাহত হল, বহুলোককে বন্দী করা হল। তাদের গীর্জাগুলি ধ্বংস করে ফেলা হল। তারপর বাংলাদেশে পর্তুগীজদের প্রভাব কমে গেল এবং হুগলী মুঘল সম্রাটের অধীনে চলে গেল।

ইংরেজদের রাজ্যবিস্তার ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে ইংরেজ ও ওলন্দাজরা পর্তুগীজদের প্রধান শত্রু ছিল। ইংরেজরা ভারতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করবার চেষ্টা করলে পর্তুগীজরা প্রবল বাধা দিয়েছিল। তারপর স্যার টমাস রো নামে একজন দূতকে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ জাহাঙ্গীরের সভায় পাঠালেন। তিনি জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহে ইংরেজদের জন্য বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের অনুমতি পেলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের নানাস্থানে এইভাবেই ইংরেজরা ব্যবসা-বাণিজ্য করবার অধিকার লাভ করল।

এর প্রায় চল্লিশ বছর পর বাংলাদেশে ইংরেজদের সৌভাগ্যের পথ খুলে গিয়েছিল। সে সময় শা'সুজা ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। তাঁর অন্তঃপুরের একজন মহিলা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বোটন নামে একজন ইংরেজ ডাক্তারের চিকিৎসায় তিনি সেরে ওঠেন। সেজন্য সুজা

ইংরেজদের বছরে তিন হাজার টাকা দেবার শর্তে বাংলাদেশে কুঠিস্থাপন করে ব্যবসা করবার অনুমতি দিলেন। কাশিমবাজার, হুগলী, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে এরা ব্যবসা শুরু করে দিল।

শাজাহানের পর ঔরঙ্গজেব বাদশা হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা বাদশাহের আদেশ সবসময় মানত না। তাই ইংরেজরা দেখল যে বাংলাদেশে জোর করে নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করতে না পারলে সুবিধা হবে না। তারা হুগলী বন্দর লুঠ করে চট্টগ্রাম বন্দরটি দখল করবার চেষ্টা করল। এই খবর শুনে ঔরঙ্গজেব খুব রেগে গেলেন। তিনি বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁকে আদেশ দিলেন যে ইংরেজরা যদি ক্ষতিপূরণ না দেয় তবে যেন তাদের সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। কিছুকাল পরে দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে ইংরেজরা মুঘলসম্রাটের সঙ্গে তখনকার মত সব গণ্ডগোল মিটিয়ে নিল। তখন ঔরঙ্গজেব বাৎসরিক তিন হাজার টাকার পরিবর্তে বিনা শুল্কে আবার ইংরেজদের বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার অনুমতি দিলেন।

এবার ইংরেজরা আর হুগলীতে ফিরে গেল না। তাদের নেতা জব চার্নক গঙ্গার তীরে সুতানুটি গ্রামে এসে একটি নতুন বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করলেন। এর কয়েক বছর পরে পশ্চিমবঙ্গে একটি বড় রকমের বিদ্রোহ হয়। তখন নবাবের অনুমতি নিয়ে তারা সুতানুটি রক্ষার জন্য একটি দুর্গ নির্মাণ করে তার নাম দিল ফোর্ট উইলিয়াম। এইভাবে ইংরেজদের আত্মরক্ষার শক্তি আরও বেড়ে গেল। আরও কিছুকাল পরে তারা সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা নামে তিনখানি গ্রাম কিনে নিল। তখন থেকেই বর্তমান কলকাতা শহরের পত্তন হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর সময় দিল্লীর বাদশা ফারুখ্‌শিয়রের কাছ থেকে ইংরেজরা আরও কিছু সুবিধা আদায় করে নিল। এইভাবে তাদের নানাপ্রকারে শক্তি বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও মুর্শিদকুলী খাঁ ইংরেজদের বশে রেখেছিলেন। আলিবর্দী খাঁ কিন্তু ইংরেজদের কাছ থেকে নিয়মিত

কর আদায় করতেন, বাড়াবাড়ি একেবারেই সহ্য করতেন না। তিনি ইংরেজদের পরাক্রম বুঝতে পেরে সিরাজউদ্দৌলাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন।

সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে সংঘর্ষ ঃ দাক্ষিণাত্যে তখন ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলছিল। ইংরেজরা নবাবের আদেশ অগ্রাহ্য করে কলকাতার দুর্গ মেরামত করতে আরম্ভ করে। এই কারণে সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ বাধে। আরও একটা কারণ ছিল। নবাব যাদের শত্রু মনে করতেন ইংরেজরা তাদের আশ্রয় দিত। তাই ইংরেজদের শাস্তি দেবার জন্য তিনি কলকাতা আক্রমণ করলেন ও সেখান থেকে ইংরেজদের তাড়িয়ে দিলেন। সেইসময়ে মাদ্রাজ শহরটি ছিল ইংরেজদের সবচাইতে শক্ত ঘাঁটি। কলকাতার দুর্ঘটনার সংবাদ সেখানে পৌঁছোলে সেনাপতি ক্লাইভ ও নৌ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন সৈন্যসামন্ত নৌবহর নিয়ে কলকাতায় এলেন। বিনা বাধায় তারা কলকাতা উদ্ধার করলেন। সিরাজউদ্দৌলা ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন।

এই একই সময়ে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। সিরাজের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইংরেজরা ফরাসীদের কাছ থেকে চন্দননগর কেড়ে নেয়। ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের আবার মনোমালিন্য হয়। এদিকে সেনাপতি মীরজাফর এবং রাজসভার আরও কয়েকজন প্রভাবশালী লোক মিলে সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্র করছিলেন। তাঁরা চুপিচুপি ক্লাইভের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। স্থির হল, সিরাজকে সরিয়ে মীরজাফরকে নবাব করা হবে। ইংরেজরা এই সাহায্য করবার জন্য প্রচুর অর্থ দাবী করল।

পলাশীর যুদ্ধ ঃ ক্লাইভ তিন হাজার ইংরেজ সৈন্য এবং বাইশ হাজার দেশী সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হলেন। খবর পেয়ে সিরাজ পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও আঠার হাজার ঘোড়সওয়ার নিয়ে এগিয়ে এলেন। ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আমবাগানের

মাঠে দু'পক্ষের মুখোমুখি তুমুল যুদ্ধ হল। মীরজাফর কিছু না করে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। নবাবের দুজন বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদন ও মোহনলাল বীর বিক্রমে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। কিন্তু মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ক্লাইভেরই জয় হল। সিরাজউদ্দৌলা প্রাণ বাঁচাবার জন্য নদীপথে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন ; কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন। তাঁকে মীরজাফরের পুত্র মীরনের আদেশে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। পলাশীর মাঠে সেদিন বাঙালী তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সেটা তাদের কাপুরুষতার জন্য নয় ; তাদের নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য।

তৃতীয় পাঠ

বঙ্গদেশে ইংরাজ শক্তির প্রসার

ক্লাইভ ও মীরজাফর ঃ পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসালেন। নবাব দেখলেন যে রাজকোষ প্রায় শূন্য। তাতে যে টাকা-পয়সা আছে, তাতে পূর্বের চুক্তিমত ইংরেজদের দাবীদাওয়া মেটান যাবে না। তাঁকে রাজকোষ উজাড় করে ইংরেজদের দিতে হল। যে টাকা বাকী রইল তা পরে দেওয়া হবে এরকম চুক্তি হল। তাছাড়া ক্লাইভকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করবার জন্য নবাব তাঁকে সমস্ত চব্বিশ পরগনার জমিদারী দিয়ে দিলেন। ক্লাইভ এই জমিদারী কোম্পানীকে দান করলেন।



ক্লাইভ

অন্যান্য জমিদারদের মত কোম্পানীকেও এই জমিদারীর জন্য খাজনা দিতে হত।

এই অবস্থায় পড়ে নবাবকে ছোটখাট বিদ্রোহ দমনের জন্য এবং বাইরের আক্রমণ থেকে রাজ্যরক্ষার জন্য ক্লাইভের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হত। মীরজাফর বুঝতে পারলেন, নবাব হলেও ইংরেজদের ওপর তাঁর কোনও অধিকার নেই। তাই ইংরেজদের কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজয় ঘটল। এরপরে ক্লাইভ দেশে ফিরে গেলেন।

নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের কলহঃ মীরজাফরের কাজকর্ম ও আচার-ব্যবহারে ইংরেজরা সন্তুষ্ট ছিল না। তাই কিছুদিন পরে তাঁকে বাংলার গদী থেকে সরিয়ে ইংরেজরা মীরকাশিমকে নবাব বলে ঘোষণা করল। মীরকাশিমও সন্তুষ্ট হয়ে বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনী-পুরের রাজস্ব আদায়ের অধিকার ইংরেজদের হাতে তুলে দিলেন। এইভাবে ইংরেজদের ক্ষমতা একটু একটু করে বাড়তে লাগল।



মীরজাফর



মীরকাশিম

মীরকাশিম কিন্তু মীরজাফরের মত দুর্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন না। প্রথম থেকেই তিনি ইংরেজদের হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় খুঁজতে লাগলেন। প্রথমে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে তাঁর রাজধানী

সরিয়ে মুঙ্গেরে স্থাপন করলেন। তাছাড়া ইউরোপীয় প্রথায় একদল সৈন্যও সুশিক্ষিত করলেন।

শীঘ্রই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বেধে গেল। এর আগে মুঘল বাদশা ও বাংলার নবাবরা বাষিকী খাজনা দেবার শর্তে ইংরেজ কোম্পানীকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার অধিকার দিয়েছিলেন। কোম্পানীর কোনও কর্মচারী শুধু নিজের লাভের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কোনও রকম ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারত না। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারীরা এখন দাবী করল যে বিনা শুল্কেই তাদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে ব্যবসা করতে দিতে হবে। মীরকাশিম দেখলেন যে এই দাবী মেনে নিলে দেশের বণিকদের খুব ক্ষতি হবে। তাই মীরকাশিম দেশী-বিদেশী সকল বণিকদের উপর থেকে বাণিজ্য-শুল্ক তুলে নিলেন। এতে ইংরেজ কর্মচারীদের লাভ হবে না বলে তারা প্রবলভাবে আপত্তি জানাল। এদিকে পাটনা কুঠির এলিস সাহেব জোর করে পাটনা অধিকার করবার চেষ্টা করলেন কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তখন বহু ইংরেজ সৈন্য নবাবের হাতে বন্দী হল। ইংরেজরা উপায় না দেখে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরপর তিনটি যুদ্ধে নবাবের শোচনীয় পরাজয় ঘটল।

মীরকাশিম পালিয়ে গিয়ে অযোধ্যার নবাব মুঘল সম্রাটের উজির সুজাউদ্দৌলার কাছে আশ্রয় নিলেন। এদিকে মুঘল সম্রাট শাহআলম নিজেই মারাঠা আক্রমণের ভয়ে এলাহাবাদে এসে বসবাস করছিলেন। ইংরেজদের শক্তি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখে এরা তিনজন একযোগে বাংলাদেশ আক্রমণ করলেন। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে তাঁরা ইংরেজদের কাছে সম্পূর্ণরূপে হেরে গেলেন।

এখন এই যুদ্ধের ফল কি হল তা বিশেষভাবে ভেবে দেখা দরকার। শুধু বাংলার নবাব নয়, খোদ মুঘল বাদশা ও তাঁর উজিরেরও পরাজয় হল। তাই এই যুদ্ধের ফল পলাশীর যুদ্ধের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তখন দিকে দিকে ইংরেজদের জয়জয়কার রটে গেল। স্বভাবতঃই

দেশীয় রাজাদের মন ইংরেজদের প্রতি সম্ভ্রমে ভরে গেল। এমন কি যেসব ইউরোপীয় কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করছিল তারাও ইংরেজদের সমীহ করে চলতে সুরু করল।

ইংরেজদের দেওয়ানী লাভ ঃ এদিকে কোম্পানীর শাসনে অনেক গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল ; তখন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ইংলণ্ড থেকে ক্লাইভকে আবার বঙ্গদেশে পাঠিয়ে দিলেন। এদেশে এসে তিনি সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধি করলেন। সর্ত হল যে সুজা ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুর সঙ্গে যোগ দেবেন না। তাছাড়া তিনি এলাহাবাদ ও কোরা দুটি জেলাই ইংরেজদের ছেড়ে দিলেন। ক্লাইভ এরপর বাদশাহের সঙ্গে এক নতুন বন্দোবস্ত করলেন। তিনি কোরা ও এলাহাবাদ দুটি জেলাই বাদশাহকে দিয়ে দিলেন। তাছাড়া তিনি প্রত্যেক বছর সুবা বাংলার খাজনা হিসাবে বাদশাহকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করলেন। এর বদলে তিনি বাদশাহের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করলেন। কাজেই খাজনা প্রভৃতি আদায় করা, হিসাবপত্র রাখা, বাদশা ও নবাবকে টাকা দেওয়া এই সব কিছু করার অধিকার ইংরেজরা পেল। সমস্ত কিছু মিটিয়ে দেবার পরে যা বাকী থাকত তা কোম্পানীরই লাভ হত।

এদিকে মীরকাশিমের সঙ্গে যখন যুদ্ধ বাধে তখন ইংরেজরা আবার মীরজাফরকে সিংহাসনে বসান। এর অল্পকাল পরে তাঁর মৃত্যু হয়। মীরজাফরের পুত্রদের মধ্যে একজনকে ইংরেজরা নবাব বলে ঘোষণা করল। এই নতুন নবাব ইংরেজদের বাছাই করা লোকদের দিয়ে রাজ্যশাসন করতে স্বীকারও করেছিলেন। নবাবের নিজের আর কোনও ক্ষমতা রইল না। ইংরেজরা প্রকৃতপক্ষে তখন থেকে সর্বপ্রকারে বাংলাদেশের প্রকৃত মালিক হয়ে উঠল।

কোম্পানীর কর্মচারীদের খাজনা আদায়ের কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না বলে তারা সরাসরি এই কাজের ভার নিল না। নবাবের পক্ষ থেকে বাংলার শাসনভার মহম্মদ রেজা খাঁকে দেয়া হল। রেজা খাঁ খাজনাও

আদায় করতে লাগলেন। ঠিক একইভাবে সীতাব রায় বিহারের শাসন ও খাজনা আদায় করবার ভার পেল। এরা ভয়ানক অত্যাচার করে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে ইংরেজ প্রভুদের সন্তুষ্ট রাখত।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর : ক্লাইভ দেশে চলে যাবার পর বাংলাদেশের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ল। কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে তা পরিচিত। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বইটিতে এই মন্বন্তরের ভয়াবহ রূপের বর্ণনা দেওয়া আছে। এগারশ ছিয়াত্তর সালে ভাল ফসল হল না। খেতে না পেয়ে বাংলার পথে-ঘাটে, শহরে-গ্রামে, অসংখ্য নরনারী-শিশু-বৃদ্ধ প্রতিদিন মারা যেতে লাগল। এইভাবে বাংলার তিনভাগের একভাগ লোক মারা গেল। আগে যেখানে লোকজন ছিল সেখানে বনজঙ্গলে ভরে গেল। যারা বেঁচে রইল তাদেরও শান্তি নেই। ক্ষেতে কোন ফসল নেই, বাজারে খাদ্য নেই, কিন্তু রেজা খাঁ কড়ায় গণ্ডায় খাজনা আদায় করে নিলেন। তাই যারা প্রাণে বেঁচেছিল তাদেরও দুর্দশার সীমা-পরিসীমা রইল না।

এই খবর যখন ইংলণ্ডে পৌঁছোল তখন কোম্পানীর মালিকেরা ভয় পেয়ে গেল। কারণ চাষবাস না থাকলে খাজনা দেবে কে? আর কোম্পানীর টাকাই বা আসবে কোথা থেকে? তাই চাষবাসের যাতে উন্নতি হয় তার জন্য ইংরেজরা ঠিক করল তাদের কর্মচারীরাই খাজনা আদায় করবে এবং হিসাবপত্র রাখবে। এইভাবে চলল কিছুদিন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : তখনই ইংলণ্ডের কর্তারা লর্ড কর্ণওয়ালিস নামে একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের ছেলেকে বাংলাদেশে পাঠালেন। খাজনা আদায়ের জন্য পাকাপাকি বন্দোবস্তের জন্য তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল। কর্ণওয়ালিস নানারকম খোঁজখবর করে খাজনার হার এমনভাবে ঠিক করে দিলেন যে তা আর বাড়ানো বা কমানো যেত না।

খাজনা আদায়ের সমস্ত ভার দেওয়া হল স্থানীয় জমিদারদের ওপর। আইন তৈরী করে জমিদারদের সমস্ত জমির একমাত্র মালিক বলে গণ্য করা হল। ঠিক হল, যদি নির্দিষ্ট দিনে এই জমিদাররা সমস্ত খাজনা দিতে না পারে তাহলে তাদের জমি নিলামে বিক্রি হয়ে যাবে। কর্ণওয়ালিসের খাজনা আদায়ের এই ব্যবস্থা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। এখন থেকে প্রায় আশী বছর আগে এটি বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল।



লর্ড কর্ণওয়ালিস

এই বন্দোবস্তের ফলে সরকারের খাজনা নির্দিষ্ট ভাবেই আদায় হতে লাগল; কিন্তু প্রথম দিকে জমিদার বা প্রজা কারুরই বিশেষ সুবিধা হল না। বহু কৃষক তাদের জমির মালিকানা হারালো। অনেক বড় বড় জমিদার নির্দিষ্ট দিনে খাজনা দিতে না পারায় তাদের জমি নিলামে বিক্রি হয়ে গেল। সমাজ-ব্যবস্থায় নানা পরিবর্তন দেখা দিল। তখন নানারকম আইন করে প্রজাদের কিছু কিছু উন্নতি করা হয়েছিল। ইংরেজদের শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীন ভারতে এই জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলার নবজাগরণ

এতদিন বাংলাদেশের মানুষেরা যেন ঘুমিয়েছিল। ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে উনবিংশ শতাব্দীতে তারা নতুন প্রাণের সাড়া পেয়ে নতুনভাবে জেগে উঠল। কেমন করে এই ঘটনা সম্ভব হল তা বুঝতে হলে ইংরেজরা কি কি হিসেবে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল আর আমরাই বা কোন্ কোন্ বিষয়ে পেছনে পড়েছিলাম তা একটু জানা দরকার।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে ইংরেজরা কেবলমাত্র বাংলার দেওয়ানী লাভ করে। তখনও বাংলাদেশে তাদের শাসন ব্যবস্থা চালু হয়নি। আশ্চর্যের বিষয় এর ষাট বছরের মধ্যে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশকে বাদ দিয়ে ভারতের আর সকল প্রদেশেই ইংরেজরা সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠে।

ইংরেজরা ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসেছিল। তাদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। তবুও এই অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে কি করে অবশেষে তারা সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হয়ে উঠল! এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে তখনকার পশ্চিম ইউরোপ-বাসীরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সেই সময়ের ভারতবাসীদের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর ছিলেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুশিক্ষিত সৈন্যদল ও জোরালো অস্ত্রশস্ত্র তাদের খুব বেশী শক্তিশালী করে তোলে। আর এক কারণে তারা ভারতীয়দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল; তা হল তাদের সমাজব্যবস্থা। খ্রীষ্টান ধর্মে কোনও জাতিভেদ নেই, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার ছিল। এতে সমাজে শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে একতা রাখতে পেরেছিল।

এদিকে আমরা যদি তখনকার বাংলাদেশের সমাজের দিকে তাকাই তাহলে একটি করুণ দৃশ্য চোখে পড়বে। সমাজের সমস্ত সুখ-সুবিধা একমাত্র পুরুষরাই উপভোগ করত। যেমন, পুরুষই ছিল পরিবারের কর্তা, আয়-ব্যয় তাঁরাই করতেন, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতেন ; তাছাড়া উচ্চবর্ণের কুলীনের বহুবিবাহ করবার অনুমতি ছিল। অন্য-দিকে স্ত্রীলোকদের কোনওরকম স্বাধীনতা ছিল না। তারা অন্তঃপুরে পর্দার আড়ালে থাকতেন। বাল্যবিবাহ প্রথা ছিল ; অনেক বালিকার বৃদ্ধ কুলীনের সঙ্গে বিবাহের ফলে বাল্যবয়সে বিধবা হতে হত। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। অনেক সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর একই চিতায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রীকে সহমরণে যেতে হত—একে বলা হত সতীদাহ প্রথা। পুরুষরা মনে করত এতে পরিবারের সম্মান বাড়বে। স্ত্রীলোকদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না, তাদের মন্ত্র উচ্চারণের অধিকারও ছিল না, কেননা এতে বৈধব্যদোষ ঘটবে এই রকম কুসংস্কার তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল।

এদিকে ধর্মের নামে ভণ্ডামি এসে পড়েছিল। শুধু কতগুলি আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হত। জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়েছিল। নিম্নবর্ণের লোকদের শিক্ষা দেবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। হিন্দুধর্মের উদার মতবাদকে বাদ দিয়ে কুসংস্কারের জালে জড়িয়ে পড়েছিল তখনকার বাঙালীসমাজ। এই চিত্র তখনকার ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও দেখতে পাওয়া যেত। সমাজের এইরকম অবস্থায় ইংরেজরা যে ভারতবর্ষ অধিকার করেছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না।

এই সময় আর এক বিপদ দেখা দিল। ইংরেজরা বাংলাদেশে শাসন আরম্ভ করতেই খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজে এগিয়ে এলেন। এ যেন গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত। পাদ্রীরা খ্রীষ্টান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের নিন্দা আরম্ভ করলেন। তবুও তখনকার শিক্ষিত যুবকেরা অনেকেই

হিন্দুধর্ম ছেড়ে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে লাগলেন। হিন্দু-সমাজে এই সময়ে খুবই দুর্দিন চলছিল।

আরও এক বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষের মনে শান্তি ছিল না। পরাধীন হয়েও রেহাই ছিল না ; তাদের চাকুরী থেকে বঞ্চিত করা হল। সব বড় বড় চাকুরী ইংরেজরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। বাংলার লোকেদের জন্য থাকত নেহাৎ ছোট ছোট কাজ। নিজেদের শাসন-ব্যবস্থায় বাংলার মানুষের আর বিন্দুমাত্রও হাত রইল না। তবুও এক বিষয়ে বাঙালীর ভাগ্য ভাল ছিল। যদিও বাংলার মাটিতেই প্রথম ইংরেজ শাসন সুরু হয়েছিল, তবু এখানেই প্রথম পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তন হয়। এই শিক্ষার ঢেউ এসে তখনকার বাঙালীর চিন্তাধারাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাঙালী নেতারা বুঝতে পারলেন যে জাতীয় উন্নতি করতে হলে তাদের সে সময়ের প্রচলিত শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ ও ধর্মের সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনতে হবে। তবেই বাঙালী আবার পূর্বগৌরব লাভ করে স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পারবে। এই নতুন চেতনা বাঙালীর হৃদয়ে এক নতুন আশার আলোক এনে দিয়েছিল।

উনিশ শতকের বাংলায় বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা চিন্তা, লেখা ও কাজের মধ্য দিয়ে বাঙালী জাতিকে অনেক উন্নতির দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। এদের একজনের নাম রামমোহন রায়। বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা সর্বপ্রথম রামমোহনের জীবনে ও প্রচেষ্টায় প্রকাশ পেল। তিনি তাঁর অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন যে বাঙালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যদি পাশ্চাত্য ভাবধারার মিলন ঘটাতে পারা যায় তবে বাঙালী একদিন শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হতে পারবে।

কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে রামমোহন মাত্র নয় বৎসর বয়সে মাতৃভাষা ও সংস্কৃত আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। এরও পরে আরবী, ফার্সী, ইংরেজী, গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিখে বেদ, উপনিষদ, কোরান, বাইবেল প্রভৃতি লেখা গ্রন্থগুলি পড়ে আয়ত্ত করলেন।

তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থগুলি পড়ে বুঝতে পারলেন যে সকলেই একই ঈশ্বরের কথা বলছেন।

তিনি বুঝতে পারলেন ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি মঙ্গলময়। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি 'আত্মীয় সভার' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভায় উপনিষদ্ পাঠ এবং পরম ব্রহ্মের উপাসনা করা হত। রামমোহন যে হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করতেন, তার প্রচার করেছিলেন এই সভার মধ্য দিয়ে। পরে এই সভার নাম হয় 'ব্রাহ্মসভা'। যদিও রামমোহন নিজেকে হিন্দু বলেই পরিচয় দিতেন এবং ব্রাহ্মণদের মত উপবীত ধারণ করতেন, তথাপি তিনি জাতিভেদ মানতেন না। তিনি দেবদেবীর পূজাতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি কুসংস্কার থেকে হিন্দুদের উদ্ধার করেন। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা উঠে যায়। ভারতের অবহেলিত নারীজাতি যাতে সম্মান লাভ করতে পারে তার জন্য রামমোহনের চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ করে, বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। শুধু তাই নয়, স্ত্রীশিক্ষা প্রসার করে তাদের ধনসম্পত্তির অধিকারী করবার দিকেও তিনি দৃষ্টি দিয়েছিলেন।

আমাদের দেশে তখন আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়নবিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে তেমন কোনও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। রামমোহন ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে দেশবাসীকে ঐসকল বিষয় শিক্ষা দেবার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। প্রথমে গোঁড়া পণ্ডিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসী তাঁর বিরুদ্ধে নানা বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করেন। কিন্তু সৎকাজে ঈশ্বর সহায় হন। শেষ পর্যন্ত গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে রামমোহন ইংরেজী শিক্ষা এদেশে আনতে পেরেছিলেন। আজ যে বাঙালী আধুনিক সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে তা রামমোহনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

এছাড়াও তিনি পাদ্রীদের প্রভাব থেকে বাঙালী ছাত্রদের মুক্ত করবার জন্য আলাদা একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। শ্রীরামপুরের

পাদ্রী কেরী সাহেব বাঙালীদের উৎসাহ দেবার জন্য বাংলা গদ্যে বাইবেল লিখেছিলেন। রামমোহনও তাঁর মতামত প্রকাশের জন্য বাংলাতে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার ছাড়াও স্বদেশবাসীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা দূর করবার জন্য তিনি সংবাদপত্রে আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর সেই বিশেষ রচনা-ভঙ্গীর জন্য তাঁকে বাংলা গদ্যের প্রথম স্রষ্টা বলা হয়।



রাজা রামমোহন রায়



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তখনকার দিল্লীর বাদশাহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের কথা জানাবার জন্য রাজা উপাধি দিয়ে তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠান। সেখানকার পার্লামেন্টে তিনি বাদশাহের এই বার্তা ছাড়াও বাংলার কৃষকদের দুর্দশার প্রতিকারের দাবী জানান। কিছুদিন পর ইংলণ্ডেই তাঁর মৃত্যু হয়। রামমোহনের চরিত্রের দৃঢ়তা, সমাজসেবা, দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণের জন্য তাঁকে আধুনিক যুগের 'প্রথম মানব' বলা হয়। তাঁর নিকট ভারতবাসী বিশেষভাবে ঋণী।

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন রামমোহনের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময় থেকে 'ব্রাহ্ম-

সভাকে' 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম আলোচনার জন্য 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেছিলেন। তখনকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করতেন।

অল্পবয়সের ছাত্ররা যাতে পড়াশুনা ছাড়াও নানা প্রকার ধর্ম সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয় সেজন্য দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেকালে ছাত্রদের পড়বার মত বেশী বই পাওয়া যেত না। সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তের সাহায্যে অনেক পাঠ্যপুস্তক লিখিয়ে দেবেন্দ্রনাথ শিক্ষার্থীদের বই পড়বার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এতে বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নামে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। এতে সাহিত্য, ধর্ম ছাড়াও ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে অনেক প্রকার আলোচনা থাকত। বলতে গেলে, আধুনিক শিক্ষার ধারা তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।

দেবেন্দ্রনাথ শেষ বয়সে নির্জনে ধর্মচিন্তা করবার জন্য বীরভূম জেলার বোলপুর গ্রামের একপ্রান্তে একটি আশ্রম তৈরী করলেন। এই আশ্রমই আজ 'শান্তিনিকেতন' নামে পরিচিত। পুরাকালের মুনি-ঋষিদের মত দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সহজ সরল জীবন-যাপন করতেন বলে তাঁকে সবাই 'মহর্ষি' বলত।

বিদ্যাসাগর ঃ রাজা রামমোহন যেরকমভাবে সমাজকে দোষমুক্ত করে শিক্ষাবিস্তার করতে চেয়েছিলেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও তাঁরই পথ অনুসরণ করেছিলেন। ইনি একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ছেলেবেলা থেকে নিজের চেষ্টা, বুদ্ধি ও মেধার বলে সংস্কৃত সাহিত্য, শাস্ত্রের নানা বিষয় এবং অনেক ভাষা শিখে বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই থেকে তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দেওয়া হল।

ঈশ্বরচন্দ্র অতি সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তাঁর পরিধেয় মোটা কাপড়, চাদর ও চটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

তাঁর সংকল্প ছিল স্থির ও অটল। বাংলার এই পুরুষসিংহ সেকালের বাঙালীর সামনে যে ব্যক্তিত্বের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন তা থেকে অনেকে আত্মশক্তি সঞ্চয় করবার পথ খুঁজে পেয়েছিল।

তিনি যে শুধু বিদ্যারই সাগর ছিলেন তা নয়, তাঁকে দয়ার সাগরও বলা যেতে পারে। যে কোনও মানুষের দুঃখের কথা শুনলে তিনি বেদনায় আকুল হয়ে পড়তেন। সকলের দুঃখ দূর করা ছিল তাঁর চরিত্রের এক বিশেষ দিক। হিন্দু বাল্য-বিধবাদের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে তিনি বিধবা-বিবাহ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। পরিশেষে তাঁরই চেষ্টার ফলে বিধবা-বিবাহ আইনসিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। এইজন্য তাঁকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল।



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

রামমোহনের মত ঈশ্বরচন্দ্রও বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল। তারপর সমাজের সকলেই যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে সেজন্য তিনি নানা প্রকার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন যে মাতৃভাষা ছাড়া শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয়। তিনি নূতন করে বাংলা ভাষা গড়ে তোলবার জন্য সংস্কৃত ভাষা থেকে 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি নানা গ্রন্থ রচনা করেন। সকলে যাতে পড়তে পারে এজন্য সহজ করে ছোটদের জন্য 'বর্ণপরিচয়' এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ শেখবার জন্য 'উপক্রমণিকা' তিনিই লিখে গেছেন। আজকের দিনের বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা তাঁর সময় থেকেই শুরু হয়।

এই যুগের আর একজন স্বদেশপ্রেমিকের নাম বলা যেতে পারে। তিনি হলেন ঋষি শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু। তাঁর লেখা 'আত্মচরিত', 'সেকাল ও একাল' প্রভৃতি বই থেকে সে যুগের অনেক

ঘটনার কথা জানা যায়। রাজনারায়ণ নিজের দেশকে খুবই ভালবাসতেন। মেদিনীপুরের সরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক থাকাকালে তিনি সেখানে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা' নামে একটি সমিতি গড়ে তোলেন। এই সমিতির সভ্যগণ নিজেদের এত বেশী স্বদেশী বলে মনে করতেন যে কথাবার্তার মধ্যে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করতেন না।

আরও কিছুকাল পরে তিনি সমস্ত শিক্ষিত বাঙালীদের নিয়ে আরও বড় একটি সমিতি গঠন করবার চেষ্টা করেন। বাঙালীরা যাতে বিদেশী রীতিতে পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ত্যাগ করে নিজের দেশের ভাষা, রীতিনীতি আদরের সঙ্গে গ্রহণ করে এই সমিতির তাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। তাছাড়াও রাজনারায়ণ তখনকার দিনের শিক্ষিত বাঙালীদের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার ব্যবহার, হিন্দুমতে সমাজের উন্নতিকরণ, হিন্দু চিকিৎসাপদ্ধতি ও ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে চেয়েছিলেন।

এর একবছর পরে রাজনারায়ণের এই চেষ্টা সফল করতে পেরেছিলেন নবগোপাল মিত্র। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বড় ভাইদের সাহায্যে নবগোপাল হিন্দুমেলার আয়োজন করেন চৈত্র সংক্রান্তির দিনে (১৮৬৭ খ্রীঃ)। এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত হিন্দুজাতিকে একত্র করে তাদের মধ্যে স্বদেশের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তোলা। এই কারণে এই মেলায় ভারতবর্ষকে উদ্দেশ্য করে স্তবগান হত, কবিতা পাঠ করা হত এবং দেশী জিনিসপত্রের প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হত। আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বে এই মেলাই ছিল সর্বপ্রথম জাতীয় সম্মেলন।

রাজনারায়ণ বসু যখন স্বদেশের উন্নতির কথা ভাবছিলেন তখন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে বিশেষভাবে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। রামমোহন এবং দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুসমাজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাননি। তাঁরা বহু দেবদেবী বিশ্বাস করতেন না কিন্তু উপনিষদের

ঋষিদের মত এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা করতেন। এই উপাসনা সভায় কেবলমাত্র ব্রাহ্মণরাই আচার্যের কাজ করতে পারতেন; বিবাহ ব্যাপারেও তারা বর্ণভেদ মেনে চলতেন।

ক্রমে ক্রমে তখনকার ব্রাহ্মযুবকগণ এইসব হিন্দুয়ানী অপছন্দ করতে লাগলেন। পূর্ণভাবে সমাজ সংস্কারের জন্য তাঁরা আলাদাভাবে নতুন ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি করলেন। এই সমাজে বর্ণভেদ রইল না, বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত হল, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। এদের নেতা ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্রের পিতা রামকমল সেন ছিলেন বিষ্ণুভক্ত গোঁড়া হিন্দু। এই পরিবারের ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে দীক্ষা দিয়ে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দিয়েছিলেন। তিনি এত সুন্দরভাবে বক্তৃতা দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করতে পারতেন যে, সমস্ত ভারতবর্ষের নানাস্থানের মানুষ তাঁর কথা আগ্রহভরে শুনত।

তখনকার হিন্দুসমাজের নানাপ্রকার দোষ মুক্ত করতে পেরেছিল এই ব্রাহ্মধর্ম। ব্রাহ্মদের মধ্যে সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। এদের জন্য সমাজে স্ত্রীজাতির মর্যাদা বৃদ্ধি হয় এবং স্ত্রীশিক্ষা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। সব থেকে উপকার হয়েছিল এই যে তখনকার শিক্ষিত যুবকগণ খ্রীষ্ট ধর্মে আকৃষ্ট না হয়ে দলে দলে হিন্দুধর্মেরই এক ভিন্ন রূপে এই ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল। এতে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার অনেক পরিমাণে কমে গিয়েছিল।

সেই সময়ে একদিকে খ্রীষ্ট ধর্ম ও অন্যদিকে ব্রাহ্মধর্মের চাপে পড়ে হিন্দুরা খুবই বিপদে পড়েছিলেন। হিন্দুদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তাঁকে অনেকে শুধু 'ঠাকুর' বলে উল্লেখ করেন। অনেকে তাঁকে ভগবানের অবতার বলে মনে করেন। তিনি হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃদত্ত নাম গদাধর। তিনি বিশেষ কিছু লেখাপড়া জানতেন না। লোকালয় থেকে দূরে দক্ষিণেশ্বরের নির্জন পরিবেশে তিনি কালীমাতার সাধনা

করতেন। সাধনা করে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করলেন। ধর্মে ধর্মে কোনও প্রভেদ নেই, সব ধর্মই সত্য, এবং যে কোনও ধর্মপথে ঈশ্বরলাভ করা যায়— এই গভীর জ্ঞান তাঁর মনে উদয় হয়। হিন্দুধর্মও যে ভাল, দেবদেবীর মূর্তিপূজাও যে খারাপ কিছু নয় একথা বার বার তিনি বলেছেন।



শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সহজ ও সরল ভাষায় হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করে সকলকে বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর মধুর বাণী, বিনীত ব্যবহার বহু জ্ঞানী-গুণীকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেছিল। ব্রাহ্ম যুবকগণ, খ্রীষ্টান পাদ্রীরাও তাঁর কথামৃত শুনতে আসত। এর ফলে হিন্দুধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস আবার ফিরে এলো। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সমস্ত ভারতবর্ষে, পশ্চিম ইউরোপে ও আমেরিকায় গিয়ে জগতবাসীকে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'যত মত, তত পথ' শুনিয়ে এসেছিলেন।

উনিশ শতকে বাংলায় যে জাগরণের সাড়া পড়ে যায় তার মধ্যে বাংলা সাহিত্যও একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। যে সকল যশস্বী লেখক তখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। সে সময় বাংলা ভাষায় লেখা কোনও উপন্যাস ছিল না। সংস্কৃত অথবা ইংরেজী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে কিছু কিছু লেখক উপন্যাস অথবা সাহিত্য রচনা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় 'আনন্দমঠ', 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সে সময়কার সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট অথবা স্নাতক। সরকারী কাজে ব্যস্ত থাকলেও তিনি

অসাধারণ প্রতিভাবলে বাংলা সাহিত্যের সেবা করতে পেরেছিলেন। তিনি 'বঙ্গদর্শন' নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এতে একদিকে বাংলা সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে নানারকম লেখা বের হত, আবার অপরদিকে বাংলা দেশের পিছনে-পড়ে-থাকা চাষীদের অবস্থা, দুর্দশা, সমাজের নানাবিধ গলদ প্রভৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা থাকত। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি 'বঙ্গদর্শন' পড়ে তখনকার সমাজের বিশেষ বিশেষ সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করে সেগুলি দূর করবার চেষ্টা করতেন। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত লিখে গিয়েছেন সেটি ইংরেজ আমলেও জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে সমগ্র ভারতবাসী মেনে নিয়েছিল। তাঁর লেখা 'আনন্দমঠ' ভারতবাসীকে দেশসেবার কাজে উৎসাহ দিয়েছিল। সেইজন্য তাঁকে 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র' বলা হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।



ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

পঞ্চম অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন

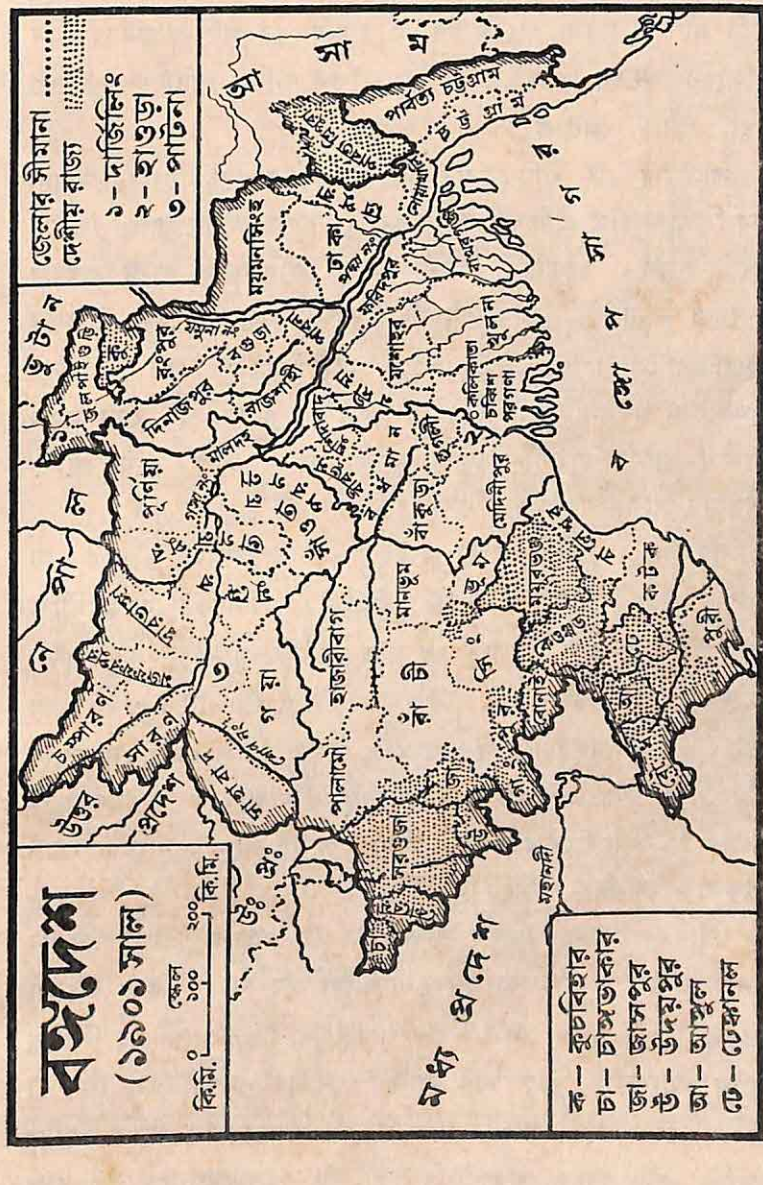
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ—এখন থেকে আটষট্টি বছর আগে। বাংলার সকল আকাশ বাতাস ভরে উঠল বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে। শত কণ্ঠে বাঙালী গেয়ে উঠেছিল,

"বাঙালীর প্রাণ. বাঙ্গালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান !"

সেদিন বাংলার বড় দুর্দিন—সেদিন আমাদের এই অখণ্ড মাতৃভূমি বাংলাদেশ দুইখণ্ডে ভাগ করে দিয়েছিল ইংরেজ শাসকদের প্রতিনিধি দোর্দণ্ড প্রতাপশালী লর্ড কার্জন।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে তখন বাংলা দেশ গঠিত ছিল। নবাবী আমলে যাকে বলা হত সুবা বাঙ্গালা। মুখে লর্ড কার্জন প্রচার করলেন যে এত বড় প্রদেশকে একসঙ্গে শাসন করা সহজ কথা নয়; অতএব একে দুই ভাগে ভাগ করা হোক। একভাগে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিভাগের অঞ্চলগুলিকে আসামের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নাম দেওয়া হবে 'পূর্ববাংলা ও আসাম।' অন্যভাগে পশ্চিমবঙ্গকে বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের সঙ্গে মিশিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হবে। কার্জনের মতে, তাহলেই শাসন কাজ খুব সহজ হয়ে যাবে।

আসলে কিন্তু কার্জনের মনে ছিল ভিন্ন মতলব। দেশপ্রেমে তখনকার বাংলা ও বাঙালী সারা ভারতের আদর্শস্থল ছিল। ইংরেজরাও বাঙালী নেতাদের ভয় করে চলত। কার্জন ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে বাঙালীর একতা এবং শক্তি নষ্ট করে দিতে হলে বাংলাকে কেটে দুটুকরো করে দেওয়াই হবে একমাত্র পথ। তাহলে দুর্বল বিভক্ত বাংলা জাতীয় ঐক্য হারিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে সাহস


বঙ্গদেশ
(১৯০৩ সাল)
জেলার সীমানা
দেশীয় রাজ্য
১—দার্জিলিং
২—হাওড়া
৩—পাটনা
স্কেল
কিমি.
কি.মি.
ময়মনসিংহ
দিনাজপুর
রাজশাহী
মালদহ
পূর্ণিয়া
হাজারীবাগ
পালামৌ
মানভূম
বাঁকুড়া
মেদিনীপুর
পার্বত্য চট্টগ্রাম

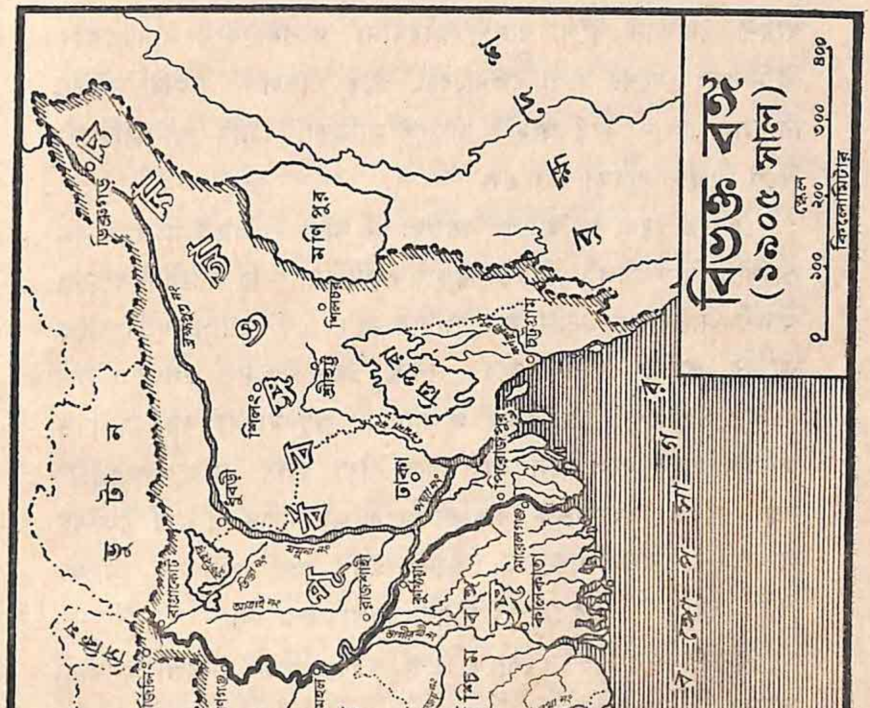
পাবে না। বণিক ইংরেজদের প্রতিনিধি ধূর্ত লর্ড কার্জন সেদিন নিজেদের লাভের দিকেই ঝুঁকেছিলেন কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ বুঝতেও দেরী হয়নি। সেই কথাই এখন বলছি।

কার্জনের এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে বাংলার নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। সাধারণ লোকেরাও ক্ষোভে ভেঙে পড়ল। ছাত্ররাও কার্জনকে এই পরিকল্পনা ত্যাগ করবার অনুরোধ জানাল। তিনি এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, রাগে ক্ষেপে গেলেন। নিজেই ঢাকায় চলে গেলেন লর্ড কার্জন। সেখানকার মুসলমানদের বুঝিয়ে বললেন যে বাংলা ভাগ হলে নতুন প্রদেশে তাদের চাকরী-বাকরীর সুবিধা হবে। এই শুনে অনেক মুসলমান বাংলা ভাগ করতে রাজী হয়ে গেল।

বঙ্গভঙ্গ : ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলাদেশ দু'ভাগ হয়ে গেল। সারা বাংলায় সেদিন ছিল অরন্ধন। শাসকেরা বঙ্গজননীকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলেছে এই দুঃখে কেউ অন্ন মুখে তুলতে পারেনি। সমস্ত বাংলায় হরতাল হল। কলকাতায় দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেল। এই মহানগরীর লোকেরা অতি ভোরে সবাই গঙ্গাস্নানে গেল। স্নান সেরে ফেরবার সময় 'বন্দেমাতরম্' গান গাইতে গাইতে একে অন্যের হাতে রাখী বেঁধে দিল। তারা সকলেই যে এক মায়ের সন্তান সেকথা বিশ্ববাসীকে শুনিয়ে দিল।

সেদিন কার্জন দম্ভভরে বলেছিলেন যে বঙ্গভঙ্গ একটি চিরন্তন সত্য—দু'বাংলা আর কখনও জোড়া লাগবে না। কিন্তু বাঙালী এই ভাগ মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারল না। বাংলায় এর বিরুদ্ধে বিপুল আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। নেতারা দেশবাসীকে বিলাতী জিনিস বর্জন করতে বলল। যারা বিদেশী জিনিস বিক্রি করত তাদের 'বয়কট' করা হল। শহরে বিলাতী বস্ত্র পোড়ানো সুরু হল আর গ্রামের মেয়েরা বিলাতী কাঁচের চুড়ি ভেঙে ফেলল।

অন্যদিকে দেশকে গড়ে তোলবার কাজও শুরু হয়ে গেল।


বিভক্ত বঙ্গ
(১৯০৫ সাল)
স্কেল
কিলোমিটার
ঢাকা
রাজশাহী
কলিকাতা
চট্টগ্রাম
শিলং
শ্রীহট্ট
মণিপুর
শিলচর
ধুবড়ী
দার্জিলিং
রাজমহল
পাটনা
বক্সার
পালামৌ
বালেশ্বর
পুরী

স্বদেশী দোকান খুলে, স্বদেশী কারখানা স্থাপন করে নানাপ্রকার জিনিসপত্র দেশের মধ্যে কেনাবেচা হতে লাগল। একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করে স্বদেশী আদর্শে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল।

দেখতে দেখতে স্বদেশী আন্দোলন সারা বাংলাকে প্লাবনের মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ভারত সরকার হুকুমনামা জারি করলেন. ছাত্ররা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিতে পারবে না। কেউ যোগ দিলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু এতে কোনও ফল হল না। সরকার তাঁর শেষ অস্ত্র কাজে লাগালেন—শুধু মারধর নয়, অগণিত জনসাধারণকে দলে দলে জেলে পুরে রাখা হল। নীরবে অত্যাচার সহ্য করেও দ্বিধাবিভক্ত বাঙালী তার আন্দোলন চালিয়ে যেতেই লাগল। একজন গাইলেন, "ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে, মোদের আঁখি ফুটবে।" এর থেকেই বিপ্লবী বাংলার জন্ম হল।

দু'বছর ধরে দুই বাংলাকে এক করবার জন্য বাঙালী নেতারা তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে গেলেন। ১৯১১ সালে ভারত-সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারত ভ্রমণে এলেন। তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য মহা-সমারোহ করে দিল্লীতে এক দরবার হয়। সেই দরবারে বহু রাজরাজড়া ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে পঞ্চম জর্জ দুই বাংলার পুনর্মিলনের কথা ঘোষণা করলেন। বাঙালী জাতি কার্জনের দম্ভ এইভাবেই চূর্ণ করতে পেরেছিল। সেইজন্য আবার বলতে হয়, যে লাভের আশায় বণিক ইংরেজ বাংলাদেশের ক্ষতি সাধন করতে চেয়েছিল তা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করতে হয়েছিল এমনি ভাবেই।

সুরেন্দ্রনাথঃ লর্ড কার্জনের বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তকে বানচাল করবার জন্য যে সব নেতা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম করা যেতে পারে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিলাতে গিয়ে তিনি আই-সি-এস হয়ে দেশে ফিরে এসে ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হলেন। সামান্য কারণে চাকুরী থেকে বরখাস্ত

হয়ে তিনি দেশগড়ার কাজে মন দিলেন। যা ছিল তাঁর নিজের ক্ষতি তাই দেশে ঈশ্বরের আশীর্বাদ-স্বরূপ হয়ে ফিরে এল। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজের প্রতিষ্ঠিত কলেজে সুরেন্দ্রনাথকে অধ্যাপক নিযুক্ত করে তাঁকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিজেও একটি কলেজ স্থাপন করে প্রায় আট দশ বছর অধ্যাপনার কাজ করেন। ছাত্রদের মনে দেশসেবার কাজের প্রেরণা তিনিই জাগিয়ে তুলেছিলেন।

এর কিছুদিন পর তিনি সারাদেশের শিক্ষিত মানুষকে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানালেন। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে তিনি দেশবাসীকে তাঁর অপূর্ব জ্বালাময়ী ভাষায় ঐক্যবদ্ধ হতে অনুরোধ করলেন। নিজের দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করবার জন্য তাঁর এই প্রচারকার্যে বহু মানুষ প্রেরণা লাভ করে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এল।

তখনকার বড়লাট লিটন নানাপ্রকারে ভারতবাসীদের অনেক ক্ষতিসাধন করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ আন্দোলন করে লিটনকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করলেন। কিছুদিন পরে আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হল। তিনি প্রথম থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসকে আরও শক্তিশালী করে তুললেন সুরেন্দ্রনাথ।

সবচাইতে বেশী ভয় করত যাঁকে ইংরেজরা তিনি হলেন সুরেন্দ্রনাথ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি ইংরেজদের কাঁপিয়ে দিয়ে বাঙালীর মনে দেশপ্রেমের উন্মাদনা জাগিয়ে তুলেছিলেন। বাঙালীর মনের এই মুকুটহীন রাজাকে দেশবাসী ''রাষ্ট্রগুরু'' আখ্যা দিয়েছিল। তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তার জনক।

আনন্দমোহন বসুঃ সুরেন্দ্রনাথের কাজে যিনি তাঁকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছিলেন তিনি হলেন আনন্দমোহন বসু। সুরেন্দ্রনাথের মত তিনিও বিলেতে গিয়েছিলেন ব্যারিষ্টারী পড়তে যাতে দেশে ফিরে এসে স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসা করতে পারেন। এইসময়ে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে

পাশ করে র‍্যাঙ্গলার উপাধি পান। তিনিই ছিলেন প্রথম ভারতীয় র‍্যাঙ্গলার।



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



আনন্দমোহন বসু

স্বদেশে ফিরে আসবার পথে যখন বোম্বাই শহরে নেমেছিলেন তখন একটি ছাত্র-সমিতি তাঁর চোখে পড়েছিল। ঐরকম একই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি জনশিক্ষা ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করবার জন্য কলকাতায় একটি সমিতি গঠন করতে চাইলেন—সঙ্গে এসে যোগ দিলেন সুরেন্দ্রনাথ। আনন্দমোহন সভাপতি, সুরেন্দ্রনাথ সহ-সভাপতি, দুজনে মিলে দেশের কাজে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিলেন। দুজনের মিলিত চেষ্টায় বাংলাদেশে সকল প্রকার আন্দোলন এমনভাবে এগিয়ে গিয়েছিল যে সে যুগের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দ-মোহনের নাম আলাদা করে ভাবতে পারা যেত না।

বঙ্গভঙ্গের পূর্বে তিনি একবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের দিন ফেডারেশন হল বা 'মিলন মন্দির' স্থাপিত হয়। এদিন যে সভা ডাকা হয় তাতে সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তখন আনন্দমোহন প্রায় মৃত্যুশয্যায়,

তবুও তিনি স্ট্রেচারে করে সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর জ্বলন্ত দেশ-প্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গদেশ জোড়া লাগবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শুধু দেশের হিতসাধনে তিনি ব্রতী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঃ সুরেন্দ্রনাথ দেশে আগুন জ্বালিয়েছিলেন তাঁর বক্তৃতায়। কিন্তু গানের সুর, কবিতার ছন্দ, চিন্তার গভীরতা দিয়ে যিনি দেশবাসীকে মাতৃসেবায় আহ্বান জানালেন তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বদেশপ্রেমিক কিশোর রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার এক অধিবেশনে গেয়ে উঠেছিলেন, "ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গা'ক,



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিপিনচন্দ্র পাল

আমরা গাব না।" বঙ্গভঙ্গ ও তারপরে বাংলার সেই অতি দুর্দিনে গানে, প্রবন্ধে তিনি দেশবাসীর মনের উৎসাহ অটুট রাখতে পেরেছিলেন। বঙ্গভঙ্গের দিন যে গান গেয়ে কলকাতার লোক দুই বাংলার মিলন প্রার্থনা করেছিল তা রবীন্দ্রনাথের লেখা। সেদিন যে রাখীবন্ধনের উৎসব হয়েছিল তাও তাঁরই কল্পনা। "স্বদেশী সমাজ" গঠন করবার চিন্তা তিনি সেইসময় থেকে শুরু করেন। স্বদেশীশিল্পে দেশবাসীকে উৎসাহ দেবার জন্য নিজের অর্থ ব্যয় করে তিনি শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে

তুললেন। এর ফলে দেশী জিনিস ব্যবহার করতে, চরকা কাটতে, তাঁত বুনতে শিক্ষিত বাঙালীদের যে সংকোচ ছিল তা ঘুচে গেল। তিনি বলতেন, "দেশ মানে তো গ্রাম, গ্রাম মানে তো গ্রামের মানুষ, স্বরাজ মানে তো তাদের স্বরাজ।" তাই তিনি বাংলার যুবকদের গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের শিক্ষা-দীক্ষা, পরিচ্ছন্ন বাসস্থান, স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলন যখন খুব প্রবল ছিল তখন ঠাকুরবাড়ীর মানুষেরা আচার-ব্যবহারে, চিন্তায়-কাজে, পোশাক-পরিচ্ছদে পুরো-পুরি স্বদেশী হয়েছিলেন ; আর এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী উৎসাহী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনীতে যখন দেশবাসী তখনকার সমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারল তখন গান্ধীজীর দেওয়া রবীন্দ্রনাথের 'গুরুদেব' আখ্যা সার্থক হয়েছিল।

বিপিনচন্দ্র পাল ঃ সুরেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে যে সকল বাঙালী যুবকের মনে আগুন ধরে গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে বিপিন-চন্দ্র পাল হলেন একজন। লেখাপড়া শেষ করে তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। তাঁর পেশা ছিল শিক্ষকতা ও সংবাদপত্রে লেখা। বক্তৃতা তিনি ভালই দিতে পারতেন। দেশে স্বাধীনতার আন্দোলনে বাংলার যুবকদের টেনে আনাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

ভারতের চা-বাগানের শ্রমিকদের দুরবস্থা তাঁকে খুব ভাবিয়ে তুলেছিল। জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এদিকে নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত এইভাবেই হল। তারপর আস্তে আস্তে তিনি কংগ্রেসের একজন বড় নেতা হয়ে উঠলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দিয়ে বিদেশী অনুকরণকারীদের একঘরে করবার প্রস্তাব তিনিই এনেছিলেন। ইংরেজদের অত্যাচার ও অবিচার তাঁকে এত ব্যথিত করেছিল যে তাঁদের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার কথা তিনি ভাবতে পারতেন না।

এই ব্যাপারে কংগ্রেস দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়। যাঁরা আবেদন

করে সরকারের কাছে শাসন সংস্কার চাইতেন তাঁরা ছিলেন নরমপন্থী। পুরোপুরি ইংরেজ বিদ্বেষী চরমপন্থীদের নেতা হলেন এই বিপিনচন্দ্র পাল। এঁরা কৃষক ও শ্রমিকদের কংগ্রেসের মধ্যে আনতে চেষ্টা করেছিলেন। সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে, লিখে, বক্তৃতা দিয়ে যে উজ্জ্বল দেশসেবার দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন তা বাংলার লোকের মনে বহুদিন জেগে থাকবে।

শ্রীঅরবিন্দ ঃ বঙ্গভঙ্গের পরের বছর বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে যোগদান করেন অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ)। তাঁর জীবন বড়ই বিচিত্র। বড়লোকের ছেলে বলে তাঁর পিতা তাঁকে সাহেবী ধরনে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। সাতবছর বয়সে তিনি বিলাতে গিয়ে চৌদ্দ-বছর সেখানে ছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানের সঙ্গে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় পাশ করেন। আই-সি-এস হবার জন্য পরীক্ষা দিলেন, পাশও করলেন, কিন্তু ঘোড়ায় চড়া শিখতে চান না বলে চাকুরী হল না। দেশে ফিরে বেশ কিছুদিন ইংরেজীর অধ্যাপক হলেন। সেই সময় তিনি বাংলা ও সংস্কৃত শিখে নিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁর কাছে আদর্শ লেখক। 'আনন্দমঠ' তাঁকে বিশেষ মুগ্ধ করেছিল।

ক্রমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রীঅরবিন্দের শ্রদ্ধা জন্মায়। তাঁর জীবনে তিনি দুটি উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন-প্রথমটি ঈশ্বরলাভ, দ্বিতীয়টি দেশের স্বাধীনতা। প্রথমটির জন্য দীক্ষা নিয়ে তিনি যোগ-সাধনা সুরু করলেন আর দ্বিতীয়টির জন্য 'আনন্দমঠের' অনুকরণে একটি আশ্রম গড়ে তুললেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি বরোদায় ছিলেন। দেশের ডাকে থাকতে না পেরে সম্মান, অর্থ সব ফেলে দিয়ে চলে এলেন। সেই সময়ে বিপিনচন্দ্র পালের 'বন্দেমাতরম্' সংবাদপত্রের সম্পাদনার ভার নিলেন শ্রীঅরবিন্দ। এই কাগজে তিনি কঠোরভাবে ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করতেন। তাঁর মত ছিল, প্রথমে আত্মনির্ভর হতে হবে, তারপর সরকারের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন করে সমস্ত

সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে। তাতেও যদি স্বাধীনতা না আসে তবে অস্ত্রের সাহায্যে বিদেশীদের তাড়াতে হবে। তাই বাংলাদেশে তিনিই প্রথম গুপ্তসমিতি সৃষ্টি করেছিলেন।

এর কিছুকাল পরে অরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলায় জড়িয়ে পড়েন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের চেষ্টায় তিনি মুক্তিলাভ করলেন। বিচারাধীন থাকাকালে যে চৌদ্দমাস তিনি কারাগারে ছিলেন, তখন গীতা-পাঠ ও যোগ-অভ্যাস করে দিন কাটাতেন।



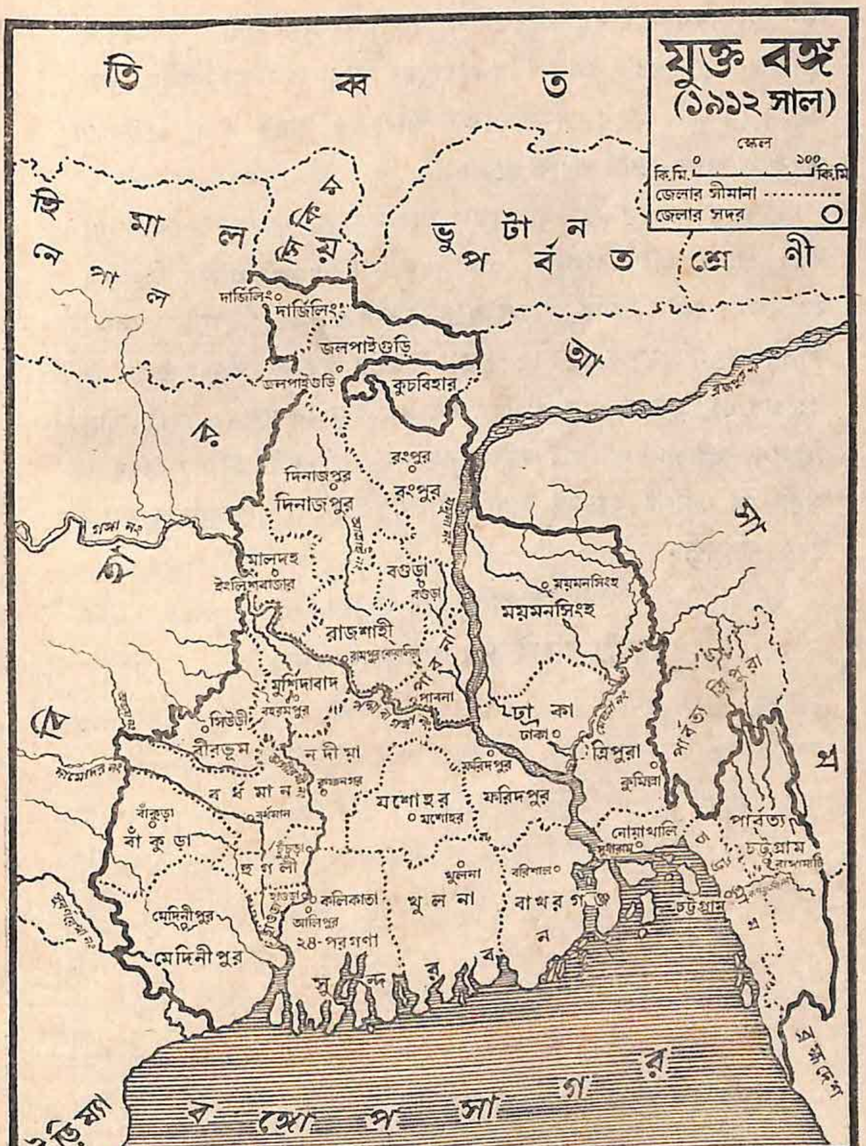
শ্রীঅরবিন্দ



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

মুক্তির পর তিনি ইংরেজের রাজত্বের সীমানা ছেড়ে প্রথমে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর ও পরে পণ্ডিচেরীতে চলে যান। পণ্ডিচেরীতে আশ্রম নির্মাণ করে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়েছিলেন। তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে মৃত্যুর কিছুকাল আগে 'দিব্যজীবন' নামে একখানা বই লেখেন। তাঁর সাধনার মূল কথা এই বইটিতে আছে।

চিত্তরঞ্জন দাশ ঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর একজন বড় নেতা। তিনি ছিলেন তখনকার বিখ্যাত ব্যারিষ্টার। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলেন। তাঁর প্রধান কাজ


যুক্ত বঙ্গ
(১৯১২ সাল)
স্কেল
কি.মি. ০ ১০০ কি.মি
জেলার সীমানা
জেলার সদর
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কুচবিহার
রংপুর
দিনাজপুর
মালদহ
ইংলিশবাজার
বগুড়া
রাজশাহী
ময়মনসিংহ
মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর
পাবনা
সিউড়ী
বীরভূম
নদীয়া
কৃষ্ণনগর
ঢাকা
ত্রিপুরা
কুমিল্লা
ফরিদপুর
যশোহর
বর্ধমান
বাঁকুড়া
নোয়াখালি
চট্টগ্রাম
হুগলী
চুঁচুড়া
খুলনা
বরিশাল
বাখরগঞ্জ
কলিকাতা
আলিপুর
২৪-পরগণা
মেদিনীপুর
হাওড়া
উড়িষ্যা
ব্রহ্মদেশ

ছিল ইংরেজের আইনের কবল থেকে বিপ্লবীদের মুক্ত করা। সে সময়ে তিনি বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে এমন আন্দোলন শুরু করেন যে এর আগে সেকথা কেউ ভাবতেও পারত না। এইজন্য তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল।

কিছুকাল পরে তিনি গান্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বস্ব ত্যাগ করে তাতে যোগ দিলেন। এই সময় তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল যে ইংরেজের আইন সভায় প্রবেশ করে ভিতরে ও বাইরে থেকে ইংরেজ-শাসন অচল করতে হবে। গান্ধীজী এতে মত না দেওয়াতে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে চলে এসে একটি পৃথক দল গঠন করলেন। এর নাম দিলেন 'স্বরাজ্য দল'। চিত্তরঞ্জন বলতেন, "দেশই আমার ঈশ্বর।" আর এই দেশের কাজেই তাঁর অকালমৃত্যু হয়। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিপ্লবী বাংলা

ভারতের জাতীয় মহাসভার যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁরা ইংরেজদের শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন আনতে চাইলেন। তখনকার সময়ে ভারতবাসীদের সরকারী ব্যাপারে কোন কথা বলার খুব কমই অধিকার ছিল। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার বিষয় সরকার বিশেষ চিন্তা করতেন না। বড় বড় চাকুরী সবই পেত শাদা চামড়ার লোকেরা। শত আবেদন-নিবেদন সত্ত্বেও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নেতাদের কথা কানে তুলত না। তারা একটু আধটু পরিবর্তন করলেও ভারতবাসীর দাবী তাতে মেটেনি, কষ্টেরও লাঘব হয়নি; বরং শোষক ইংরেজরা তাদের আরও হীন চোখে দেখতে লাগলেন। তাই এর প্রতিকার করবার জন্য নেতারা আন্দোলন শুরু করেন। বঙ্গভঙ্গের পরই প্রথম বড় আন্দোলন হয়েছিল। এরপরে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। তখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রথমে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং তার প্রায় দশ বছর পরে আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছিল। কিছুতেই যখন কোন ফল হল না তখন গান্ধীজী ইংরেজদের ভারত ছেড়ে চলে যেতে বললেন। তাঁর এই 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের পাঁচ বছর পর আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছিলাম।

এদিকে কিন্তু বয়স্ক নেতাদের এই ঢিমেতালে আন্দোলন তখনকার বাংলার যুবকদের মোটেই পছন্দ হয়নি। তাঁরা তাড়াতাড়ি দেশের স্বাধীনতা আনবার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব শুরু করতে চাইলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রের সাহায্যে যুদ্ধ করে তাদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এই বিপ্লবীরা দুটি সমিতি গড়ে তুলেছিলেন —একটির নাম 'অনুশীলন সমিতি, অপরটি 'যুগান্তর দল'। যাঁরা

এই দলের সভ্য হত তাঁদের বড়ই কঠিন জীবন যাপন করতে হত। দেশমাতার কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে তাঁরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছিলেন। এর জন্য তাঁরা মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত ছিলেন।

এই সমিতিগুলির সভ্যগণ মনের শক্তি বাড়াবার জন্য গীতা প্রভৃতি নানা পুস্তক পাঠ করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তাঁদের উদ্দীপনা জুগিয়েছিল ; শরীর গঠনের জন্য তাঁদের ব্যায়াম, কুস্তি ইত্যাদি শরীরচর্চা করতে হত। আত্মরক্ষর জন্য এবং দুষ্টের শাস্তিবিধানের জন্য তাঁদের লাঠিখেলা, বন্দুক চালনা শিখতে হত। এ ছাড়া বিপ্লবের হাতিয়ার হিসাবে তাঁরা বোমা তৈরী করতে শিখলেন। কোনও রকম বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। বাংলার বহু তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী দেশের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, কারণ ইংরেজশাসনে দেশদ্রোহিতার শাস্তি ছিল ফাঁসি অথবা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। এইসব দেশপ্রেমিকের নাম বাংলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ছাত্রদের ওপর ইংরেজদের অত্যাচারের কথা বাংলার তরুণ ও যুবকরা ভুলতে পারেনি। সে সময় কিংসফোর্ড সাহেব ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। তাঁর আদালতে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় সরকার-বিরোধী কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির বিচার হয়। বিচারের দিন আদালতের প্রাঙ্গণে বহু লোকের ভীড়, সবাই উৎসুক নেতাদের বিচারের ফলাফল জানবার জন্য। এই ভীড়ের মধ্যে সুশীল সেন নামে একটি তের কি চৌদ্দ বছরের ছেলেকে একজন পুলিশ কর্মচারী অন্যায়ভাবে মারতে শুরু করলে সেও রুখে দাঁড়িয়ে পুলিশকে ঘুষি মারে। শাস্তিস্বরূপ তাকে সকলের সামনে পনেরো ঘা বেত মারা হল।

এই খবর ক্রমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বাংলার বিপ্লবীরা ক্ষমা করতে পারল না এই ঘটনা। কিংস্‌ফোর্ড বদলী হলেন মজঃফরপুরে। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী, দুজন কিশোর বিপ্লবী, তাঁকে অনুসরণ

করে মজঃফরপুরে গিয়ে উপস্থিত হন —উদ্দেশ্য চিরতরে কিংস্‌ফোর্ডকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া। কিন্তু কিংসফোর্ডের গাড়ি বলে ভুল করে অন্য একটি গাড়িতে তাঁরা বোমা মারেন—ফলে ছুটি ইংরেজ মহিলা মারা যান। ধরা পড়বার ভয়ে প্রফুল্ল আত্মহত্যা করেন। কিন্তু ক্ষুদিরামকে ধরা দিতে হল। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।



ক্ষুদিরাম বসু

ক্ষুদিরামের বয়স ছিল মাত্র সতের বছর। বিচারের শেষে ক্ষুদিরাম বলেছিলেন, "আমার মনে কোন ছুঃখ নেই, ছুঃখের কারণও কিছু নেই। কেবল ছুটি অসহায় মহিলাকে ভুলে মেরে ফেলেছি। গীতা আমি পড়েছি। ভয় আমার মনে এক ফোঁটাও নেই।" তিনি দৃঢ়পদে, প্রশান্ত চিত্তে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি প্রত্যেকটি বাঙালীর মনে গভীর ছুঃখের দাগ কেটে দিয়েছিল। এই ঘটনা নিয়ে একজন অজ্ঞাতপরিচয় কবি তোমাদের জন্য অতি পরিচিত গান লিখেছিলেন : "একবার বিদায় দে' মা ঘুরে আসি।" ক্ষুদিরামই ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম শহীদ। এই ঘটনাটি ঘটেছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তিন বছর পর। প্রতিশোধ নেবার জন্য বিপ্লবীরা বড়লাট এবং ছোট লাটের ট্রেন উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সফল হলেন না।

তারপর ক্ষুদিরামের মামলার জের ধরে পুলিশ একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার অভিযোগে বহু বিপ্লবীকে আটক করা হয়। এর মধ্যে অরবিন্দ ঘোষও ছিলেন। সরকার পক্ষ তাঁকেই এসবের নেতা বলে মনে করেছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে যে মামলা আনা হয় তার নাম "আলিপুর ষড়যন্ত্র

মামলা।" বন্দীদের মধ্যে নরেন গোঁসাই সমস্ত গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। এই খবর জানতে পেরে বন্দী অবস্থায়ই কানাইলাল দত্ত এবং সত্যেন বসু তাঁকে হত্যা করে ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার ছিলেন। অরবিন্দ মুক্তি পেলেন, কিন্তু কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসুর ফাঁসির হুকুম হল। দশ জনের দ্বীপান্তরের আদেশ হল, আর বাকী আসামীদের দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ড হল। কিন্তু বিপ্লবীরা এতে একটুও ভয় পেলেন না। আলিপুর মামলায় যিনি সরকারের পক্ষের উকিল ছিলেন, তাঁকে হত্যা করে একজন বিপ্লবী ফাঁসি বরণ করে নিলেন। এরপর থেকে প্রায় প্রত্যেক বছরই কোনও না কোন অত্যাচারী রাজকর্মচারী বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ হারায় আর বিপ্লবীরাও হাসতে হাসতে প্রাণ দেন।

এইভাবে প্রাণ দিয়েও কিন্তু বিশেষ লাভ হল না। তখন বিপ্লবীরা এক নতুন পথ ধরলেন। তাঁরা বাইরের শক্তির সাহায্যে ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার মন্ত্রণা করলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ হবার তিন বছর পর সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এক বিরাট যুদ্ধ বাধে—একে 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধ' বলা হয়। এক পক্ষে ছিল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া ও আমেরিকা, অপর পক্ষে জার্মানী ও তাঁর মিত্রগণ। এই যুদ্ধ চার বছর ধরে চলেছিল। এই সময় আমাদের বিপ্লবীরা জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বিপ্লবীদের নায়ক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), রাসবিহারী বসু ও মানবেন্দ্রনাথ রায় (আসল নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)।

ভারতের বিপ্লবীরা জার্মানীর সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন। তাতে ঠিক হল, জার্মানী বিপ্লবীদের খরচ চালাবার জন্য টাকা-পয়সা ধার দেবে এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে তা শোধ দেওয়া হবে। যুদ্ধের জন্য জার্মানী জাহাজে করে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবে। সেসব অস্ত্র গোপনে উড়িষ্যায় বালেশ্বরে এবং বাংলায় সুন্দরবনের কাছে নামিয়ে দেওয়া হবে।

জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য মানবেন্দ্রনাথ বাটাভিয়া (জাভা) যান, আর কয়েকজন ব্যাংকক, টোকিও প্রভৃতি জায়গায় যান।

এদিকে বিপ্লবীরা যুদ্ধের জন্য তোড়জোড় করতে লাগলেন। রেলপথে যাতে ইংরেজপক্ষের সৈন্য চলাচল করতে না পারে সেজন্য রেলসেতু উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হল। পাঞ্জাবে বিপ্লব আনবার এবং দেশী সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটাবার ভার পড়েছিল রাসবিহারী বসুর উপর। বাংলায় বিপ্লব ঘটিয়ে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দখল করবার ভার নিলেন স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ।

ম্যাভেরিক নামে একটি জার্মান জাহাজ বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র, গুলিগোলা, বন্দুক প্রভৃতি নিয়ে আসছিল। ঠিক ছিল, উড়িষ্যায় মহানদীর তীরে সেসব অস্ত্র-শস্ত্র নামানো হবে। যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে একটি দোকান খুলে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও চারজন বিপ্লবী। পুলিশ তাঁদের গোপন উদ্দেশ্য টের পেয়ে পিছু নিল। তখন তাঁরা গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। পুলিশদের সঙ্গে একদল ঘোড়সওয়ার সৈন্যও ছিল। বুড়ীবালাম নদীর তীর পর্যন্ত গিয়ে বিপ্লবীরা আর পালাতে পারলেন না। তখন ইংরেজসৈন্য ও পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এই অসীম সাহসী বাঙালী বিপ্লবীদের। শত্রুপক্ষের অনেকে হতাহত হলেও বিপ্লবীদের গুলি-গোলা ফুরিয়ে আসছিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর যতীন্দ্রনাথ মারাত্মক-ভাবে আহত হন। এই খবর পেয়ে ইংরেজরা জাহাজখানি আটক করে। তখন একজন বিপ্লবী সেইখানেই মারা গেলেন, আর তিনজন আহত হয়ে ধরা পড়েন। এঁদের মধ্যে একজন পাগল হয়ে যান এবং পরে মারা যান, দু'জনের ফাঁসি হয়। বাঘা যতীন ধরা পড়ে হাস-পাতালে মারা গেলেন। যতীন্দ্রনাথ বলতেন, "আমরা মরব, জাতি জাগবে।"

এদিকে রাসবিহারী বসু লাহোরে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ করবার আয়োজন করছিলেন। বিদ্রোহের দিনও ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু পুলিশ

সব জানতে পারল। রাসবিহারী সেখান থেকে পালিয়ে এলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন জাপানে যান, তখন তিনি ছদ্মনাম নিয়ে কবির সঙ্গে জাপানে চলে যান। জীবনের বাকী দিনগুলি তিনি জাপানেই কাটিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।

ওদিকে বাটাভিয়ায় যাবার পর মানবেন্দ্রনাথের খবর অনেকদিন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সেখান থেকে তিনি আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি রাশিয়াতে চলে গেলেন।


রাসবিহারী বসু


মানবেন্দ্রনাথ রায়

সেখানে তিনি প্রসিদ্ধ রুশনেতা লেনিনের সঙ্গে অনেক দিন কাজ করেছিলেন। তারপর স্ট্যালিনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হওয়ায় তিনি ভারতবর্ষে চলে আসেন। শেষ জীবনে তিনি পৃথিবীর মানুষের উন্নতি ও মঙ্গল কামনায় তাঁর নিজের উদার মতবাদ প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ভারতের মানুষ আশা করেছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেশশাসনের ব্যবস্থা ইংরেজরা অনেকখানি ভারতবাসীদের হাতে ছেড়ে দেবে। ভারতবাসীদের এই আশা সফল তো হলই না, বরং উল্টে তাদের দমন করবার জন্য একটি কঠোর আইন পাশ করা হল। তখন তাদের

মনে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। পূর্ব পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে যখন এইরকম একটি বিক্ষোভ-সভা হচ্ছিল, তখন সেখানকার ইংরেজ সেনাপতি সমস্ত পথ বন্ধ করে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করেন। ফলে চারশ' লোক সেইখানেই মারা যায়, প্রায় দু'হাজার লোক ভয়ানকভাবে জখম হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সমস্ত ভারতে তুমুল বিক্ষোভ দেখা দেয়। এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইট' উপাধির সার্টিফিকেট ফিরিয়ে দিলেন, গান্ধীজী সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করলেন। বাংলাদেশের চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি অনেক বড় বড় নেতা ঐ আন্দোলনে যোগদান করেন।

কোনও রকম অস্ত্রের সাহায্য ছাড়া, মনে কোনও হিংসার ভাব না রেখে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই ছিল নূতন রকমের আন্দোলনের মূল নীতি। গান্ধীজী দেশবাসীকে ডেকে বললেন যে ইংরেজদের শাসনকার্যে ভারতবাসী কোনও সাহায্য করবে না, তাহলেই তাদের শক্তি আপনা-আপনি ভেঙে পড়বে। এই নতুন আন্দোলন দমন করবার জন্য ইংরেজ ভারতবাসীদের দলে দলে জেলে পুরতে আরম্ভ করল। পুলিশের মারধোর, অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দু'একটি জায়গায় উল্টে পুলিশকেই দেশের লোকেরা মারতে লাগল। গান্ধীজী বুঝতে পারলেন যে তখন পর্যন্ত জনসাধারণ অহিংস আন্দোলনের জন্য মনে-প্রাণে প্রস্তুত হতে পারেনি। তিনি দুঃখিত চিত্তে এই আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিপ্লবীরা চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু এই আন্দোলন বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আবার কাজে নেমে পড়লেন। এদিকে ওদিকে অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করা হতে লাগল। আসলে বিপ্লবীরা গোপনে নিজেদের আরও শক্তভাবে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছিল। 'অনুশীলন', 'যুগান্তর' ছাড়াও এসময়ে আরও কয়েকটি গুপ্ত দল বিপ্লবীরা গড়ে তুলেছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রায় দশ বছর পর গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন। ইংরেজদের কতকগুলি আইন দেশবাসীদের কাছে খুবই অন্যায় বলে মনে হত। যেমন, যদি কেউ সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরী করত, তবে তাকে আইনের বলে শাস্তি পেতে হত। অথচ দেশের গরীব মানুষ এই লবণটুকু দিয়ে ভাত অথবা ছাতু খায়। ভারতের মত গরীব দেশে সাধারণ মানুষ কেন লবণ তৈরী করতে পারবে না, এই প্রশ্ন মনে রেখে গান্ধীজী নিজে ডাণ্ডিতে (কচ্ছ উপসাগরের কাছে) গিয়ে সদলবলে লবণ প্রস্তুত করে আইন অমান্য করলেন। ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশে এই আন্দোলনের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল।

এই নূতন আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল এক অভাবনীয় দুঃসাহসের কাজ করে ফেললেন। তাঁদের নেতা ছিলেন সূর্য সেন। তিনি সকলের কাছে 'মাস্টারদা' নামে পরিচিত ছিলেন। সূর্য সেন ও তাঁর সহকারী বিপ্লবীদল চট্টগ্রামে সরকারী অস্ত্রশালা লুটপাট করে বহু অস্ত্র-শস্ত্র যোগাড় করলেন। এ খবর যাতে বাইরে যেতে না পারে সেজন্য তাঁরা টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দিলেন, আর দু-এক জায়গায় রেল লাইনও তুলে ফেললেন। এরপর বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের বাইরে জালালাবাদ পাহাড়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। সেখানে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে বিপ্লবীদের যুদ্ধ বেধে গেল। কয়েকজন বিপ্লবী মারা গেলেন। যাঁরা বেঁচে রইলেন তাঁরা এদিক ওদিক পালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত সকলকেই ধরা পড়তে হয়। বিচারে সূর্য সেন ও আর একজনের ফাঁসির হুকুম হল, আর বাদবাকীরা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের শাস্তি পেলেন। এর কিছুকাল পরে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার



সূর্য সেন (মাস্টারদা)

নামে সূর্য সেনের একজন মহিলা কর্মী দলবল নিয়ে চট্টগ্রামের শ্বেতাঙ্গদের একটি "ক্লাব" আক্রমণ করেছিলেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে সাহেবদের গোলাগুলি বিনিময় হয়। প্রীতিলতা আহত হন ও ধরা পড়বার ভয়ে আত্মহত্যা করেন।

এই একই সময়ে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে বিপ্লবীরা ইংরাজদের মনে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। বাংলাদেশের সুসন্তান সুভাষচন্দ্র বসু একটি স্বেচ্ছা সৈনিকবাহিনী গঠন করেছিলেন। এটি "বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স" নামে পরিচিত। ঢাকা শহরে এর একটি প্রধান



বিনয় বসু



বাদল গুপ্ত

কেন্দ্র ছিল। ঢাকার মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র বিনয়কৃষ্ণ বসু স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনীর একজন সক্রিয় সভ্য ছিলেন। তিনি ক্রমে মেজরের পদ লাভ করেন। ইংরেজ কর্মচারীদের শাস্তিবিধানের জন্য তিনি মন স্থির করেন। তিনি বাংলার পুলিশ বিভাগের সর্বেসর্বা লোম্যান সাহেবকে গুলি করে মেরে ফেলেন। আরও কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী একই ভাবে প্রাণ হারান। "বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স" দলের আর দুজন সুদক্ষ সভ্য ঢাকার বাদল গুপ্ত ও মেদিনীপুরের দীনেশ গুপ্ত। দলের মধ্যে এঁরা বড় বড় পদে আসীন ছিলেন। একদিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ

ঢুকে দীনেশ গুপ্ত বাংলার কারাবিভাগের বড়সাহেব সিম্‌সন্‌কে হত্যা করলেন। দীনেশের সঙ্গে ছিলেন লোম্যান হত্যাকারী বিনয় বসু এবং বাদল গুপ্ত। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে এঁদের ঘিরে ফেলে। তখন দু' পক্ষের সংঘর্ষ বেধে যায়। পালাবার কোনও পথ ছিল না। তাই বিনয় নিজে রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করেন। বাদল বিষ খেয়ে মারা যান। দীনেশও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেই তিনি ধরা পড়লেন। হাসপাতালে মাথায় অস্ত্রোপচারের পর গুলি বার করে তাঁকে সুস্থ করা হল। তারপর বিচারে তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই হল বিপ্লবীদের প্রতি ইংরেজের প্রতিহিংসার নমুনা। এই সময় মেদিনীপুরে পর পর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লবীদের হাতে প্রাণ হারায়। কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেটকেও দুজন কিশোরী মহিলা হত্যা করেন। আর একজন মহিলা বাংলার লাটকে হত্যা করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তা'ছাড়া আরো কয়েকজন অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীকেও প্রাণ দিতে হয়েছিল। সরকার নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে এইসকল দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের দমন করে।



দীনেশ গুপ্ত

বিপ্লবীদের দলে দলে এইভাবে প্রাণ দেবার সময়ে একই সঙ্গে দেশের অন্যান্য আন্দোলনগুলিও সমানে চলছিল। মেদিনীপুরের কথা এখানে বিশেষভাবে বলা যেতে পারে। আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রায় বার বছর পরে গান্ধীজী 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বারে বারে নানারকম জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করে মেদিনীপুরের নারী ও পুরুষের মধ্যে দেশের কাজের জন্য সাড়া পড়ে যায়। পুলিশের অত্যাচার তাঁদের অনেক সহ্য করতে হয়েছিল।

মাতঙ্গিনী হাজরা ঃ মেয়েদের মধ্যে মাতঙ্গিনী হাজরার নাম সকলের আগে বলা যেতে পারে। ১৯৩০ সাল থেকে তিনি মেদিনীপুরের

সকল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনেও মেদিনীপুরবাসীরা এগিয়ে এল। তমলুক শহরে একই সময়ে একই দিনে পাঁচ পাঁচটি বিরাট শোভাযাত্রা পাঁচদিক থেকে বের হয়ে শহরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। এদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ছিল শহরের থানা দখল করে নেওয়া। ইংরেজও প্রস্তুত হতে লাগল। দেশী ও বিদেশী সৈন্য শহরে জড় করা হল। একটি শোভাযাত্রা যখন শহরের অনেকটা কাছে এল তখন তাদের ওপর মারপিট শুরু হয়ে গেল। অন্যদিক থেকে আরেকটি শোভাযাত্রার সর্বাগ্রে ছিলেন বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। পুলিশ এঁদের উপরও গুলি চালাল। শোভাযাত্রা চারিদিকে ছড়িয়ে গেল।



মাতঙ্গিনী হাজরা

কিন্তু মাতঙ্গিনী দেবী জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে সবাইকে ফিরে আসবার ডাক দিয়ে নিজেই এগিয়ে এলেন। ডাক শুনে শোভাযাত্রীরা ফিরে দাঁড়ালেন। তাদের একসঙ্গে নিয়ে মাতঙ্গিনী দেবী যখন এগিয়ে আসছিলেন তখন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। গুলিবিদ্ধ হয়েও তিনি জাতীয় পতাকা হাতছাড়া করেননি। সেই অবস্থাতেই তিনি বীরাঙ্গনার মত মৃত্যু বরণ করেন। মেদিনীপুরবাসীদের এই আন্দোলনের ফলে কিছুদিনের জন্য সেখানে একটি স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছিল। সেদিনকার স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের মানুষের আত্মদানের কথা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

শুধু দেশের মধ্যে থেকেই নয়, দেশের বাইরে গিয়েও ভারতকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। এই চেষ্টা করেছিলেন দেশপ্রেমিক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের একজন বড় নেতা ছিলেন। গান্ধীজীর আন্দোলন তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ

করতে পারেননি। তাঁর পথ ছিল বিপ্লবের পথ। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর জেলে বন্দী করে রাখা হল। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল। সরকার কোনও উপায় না দেখে তাঁকে বাড়ীতে কড়া পাহারায় রেখে দিল, যাতে তিনি পালিয়ে যেতে না পারেন। কিন্তু একদিন সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান করলেন সকলের চোখ এড়িয়ে।


নেতাজী সুভাষচন্দ্র

প্রথমে তিনি আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুল হয়ে জার্মানীতে চলে গেলেন। তখন ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে যত ভারতীয় বিপ্লবী ছিলেন তাঁরা সকলেই জার্মানীতে জড় হলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর সাহায্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান। তাছাড়া ইংরেজরা যুদ্ধ করবার জন্য অনেক ভারতীয় সৈন্য ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিল। এদের অনেকেই জার্মানীর হাতে বন্দী হয়েছিল। এই দুই দল ভারতীয়দের একত্র করে সুভাষচন্দ্র একটি স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী গঠন করেন। তাছাড়া তিনি নিজে জার্মানদের কাছে যুদ্ধবিদ্যার কৌশল শিখে নিলেন। ভারতবাসীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাতে তিনি প্রায়ই জার্মান বেতার থেকে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আহ্বান জানাতেন।

আবার এদিকে জাপানও ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটির পর একটি দেশ জয় করে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের হাত থেকে সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রহ্মদেশ কেড়ে নিল। এই সুযোগে সেই সব দেশের ভারতবাসীরা একত্র হয়ে জাপানের সাহায্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের ভারতের মাটি থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা করতে চাইল। জাপান রাজী হল। তখন তারা 'স্বাধীন ভারতীয় সংঘ' নামে একটি সরকার গঠন করল।

এর সভাপতি হলেন রাসবিহারী বসু। জাপানের হাতে ভারতীয় বন্দী সৈন্যদের মধ্যে ক্যাপ্টেন মোহন সিং-এর উপর একটি স্বাধীন সৈন্য-বাহিনী গঠন করবার ভার দেওয়া হল। এই সৈন্যবাহিনীই হল সেই বিখ্যাত "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ" বা আই. এন. এ.।

কিন্তু মোহন সিং-এর সঙ্গে জাপানীদের বনিবনা হল না। তাঁকে জাপান সরকার বন্দী করল। এতে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' ভেঙে পড়বার উপক্রম হল। বার্লিনে সুভাষচন্দ্র একথা শুনে খুবই বিচলিত হলেন। একটি জার্মান ডুবোজাহাজে করে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে তিনি সিঙ্গাপুরে চলে এলেন। রাসবিহারী বসু 'ভারতীয় স্বাধীন সংঘ' থেকে পদত্যাগ করলেন। সুভাষচন্দ্র সভাপতি হলেন। তাঁর সিঙ্গাপুরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়রা যেন নূতন প্রাণ পেলেন। সবাই তাঁকে 'নেতাজী' বলে অভিহিত করলেন। তিনি 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজের' সৈন্যদের ডেকে বললেন, "চলো দিল্লী, দিল্লী চলো। জানি না যুদ্ধশেষে তোমাদের মধ্যে কতজন বেঁচে থাকবে, তবে একথা ঠিক, যুদ্ধে জয় হবে আমাদেরই। দিল্লীর লাল কেল্লায় বিজয়ী বীরের বেশে প্রবেশ না করা পর্যন্ত তোমাদের কাজ শেষ হবে না।"

'আজাদ হিন্দ্ ফৌজে' হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান সকল ধর্মের মানুষ ছিল। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—এঁদের নামে এক একটি সৈন্যদল গঠন করা হয়। বহু নারী 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'-এ যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের নিয়ে 'ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ' নামে একটি নারীবাহিনী গঠন করা হল।

একই সময়ে 'স্বাধীন ভারতীয় সরকার' গঠন করলেন নেতাজী। তিনি এই সরকারের একাধারে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, এবং প্রধান সেনাপতি হলেন। এই স্বাধীন সরকারের খরচপত্র চালাবার জন্য সেখানকার ভারতবাসী তাঁদের টাকা-পয়সা, অলঙ্কার প্রভৃতি যথাসর্বস্ব অকাতরে দান করেছিলেন। স্বাধীন সরকারের জন্য জাতীয় সঙ্গীত

তৈরি হল, "কদম কদম বঢ়হায়ে জা"। তখন সকলেই উৎসাহের সঙ্গে নেতাজীর নির্দেশমত কাজ করতে লাগল।

এরপর নেতাজীর আদেশে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' স্থলপথে ভারতবর্ষের দিকে এগুতে থাকে। যুদ্ধ করতে করতে তারা ব্রহ্মদেশ পার হয়ে আসামে ঢুকে পড়েছিল। এরা শিলচরের কাছে কাছাড় জেলার কোহিমা, বিষেণপুর প্রভৃতি জায়গা দখল করে নিল।

কিন্তু এদিকে দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। জাপান হেরে যেতে লাগল ইংরেজ ও আমেরিকার হাতে। তার ফলে জাপানীদের কাছ থেকে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সৈন্যরা খাদ্য, পোশাক, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম কিছুই না পেয়ে খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ল। তার উপর শুরু হল প্রবল বর্ষা। এদের কোনও নিজস্ব বিমান না থাকায় শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেনি। এইসব কারণে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' পিছু হটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল।

এর কিছুকাল পরেই জাপান থেকে খবর পাওয়া গেল, নেতাজীর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এই মৃত্যুসংবাদ অনেকেই বিশ্বাস করেন না। সুভাষচন্দ্রের 'নেতাজী' নাম সার্থক হয়েছিল, কারণ সত্যিই তিনি একজন মহান নেতা। তিনি শুধু বাংলার রত্ন নন, তিনি সমস্ত ভারতের গৌরব।

সপ্তম অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর বাংলা—বাঙালীর গৌরব

উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের পর বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছিল সমস্ত ভারতবর্ষের আদর্শ। মহারাষ্ট্রের গোপালকৃষ্ণ গোখলের মত একজন শ্রেষ্ঠ নেতাও তখন বলেছিলেন, "আজ বাংলাদেশ যা ভাবে, সমস্ত ভারতবাসী সে সম্বন্ধে ভাববে আগামীকাল। সমস্ত ভারতবাসীর হবে তাই আগামী কালের ভাবনা।" যাঁদের পুণ্যময় জীবনের কীর্তিতে বাংলার মানুষ আজ সকলের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে, এখন তাঁদের কথাই একে একে আলোচনা করব।

স্বামী বিবেকানন্দঃ বিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই আমরা দেখতে পাই একজন অসাধারণ মহাপুরুষ বাংলার আকাশে দীপ্তি পাচ্ছেন। তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। মাত্র উনচল্লিশ বছর তিনি বেঁচে ছিলেন ; আর তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজগুলি তিনি সমাপ্ত করেছিলেন জীবনের শেষ দশ বছরে। শুধু বাঙালী কেন, সমস্ত ভারতবাসীর উন্নতির জন্য যেসব কাজ তিনি আরম্ভ করেছিলেন, সেগুলি বিংশ শতাব্দীতে পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করেছিল। তাই বিংশ শতকের বাংলার ইতিহাস তাঁকে দিয়েই শুরু।


স্বামী বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ছাত্রাবস্থায় পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র পড়ে তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে উঠলেন। তাঁর মন-প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল। সেই সময়

একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে গেলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি সোজাসুজি ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি ঈশ্বর, ঈশ্বর বলেন; আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "হ্যাঁ, দেখেছি বই কি, এই তোকে যেমন দেখছি, তেমনি তাঁকেও আমি দেখতে পাই।" উত্তর শুনে নরেন্দ্রনাথ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। এর আগে কত মানুষকেই তিনি প্রশ্ন করেছেন, কিন্তু কই এমন সহজভাবে তো এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারেনি! সেইদিন থেকে নরেন্দ্রনাথের জীবনে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। তিনি ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করলেন। এই সন্ন্যাসীই আমাদের কাছে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর বিবেকানন্দ প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে তাঁর গুরুর অমৃত বাণী প্রচার করেছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, তেমনিই চমৎকার ছিল তাঁর বক্তৃতা। এই বক্তৃতার গুণে তিনি বহু মানুষকে কাছে টেনে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

এর কিছুকাল পরে আমেরিকার চিকাগো শহরে পৃথিবীর সকল ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি সভা ডাকা হয় (ধর্ম মহাসম্মেলন)। স্বামীজীও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। সভায় বক্তৃতা করতে উঠে প্রথমেই সম্বোধন করলেন, "আমার আমেরিকাবাসী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ!" কোনও রকম কুণ্ঠা নেই, কৃষ্ণকায় ভারতবাসী বলে কোনও রকম দ্বিধা নেই, পাশ্চাত্যবাসীরা যেরকম নিজেদের মধ্যে সম্বোধন করেন সেই রকমই তিনি আমেরিকা-বাসীদের পরমাত্মীয়ের মত আহ্বান করে সভার সকল মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন। এই সভায় বক্তৃতা করে তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তখন সেখানকার একটি সংবাদপত্র লিখেছিল, "হিন্দুদের মত পণ্ডিতজাতিদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য পাদ্রীদের পাঠান অত্যন্ত বোকামীর কাজ, একথা স্বামীজীর বক্তৃতা শুনে আমরা বুঝতে পেরেছি।"

এরপর আমেরিকা থেকে তিনি ইংলণ্ডে যান। সেখানেও তিনি অনেক সম্মান লাভ করেছিলেন। প্রায় সাড়ে তিন বছর তিনি ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় থেকে দেশে ফিরে এলেন। এরও কিছুদিন পর তিনি প্যারিসের ধর্মসভায় যোগদান করেছিলেন। এই সময়ে বহু বিশ্ব-বিখ্যাত দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

বিবেকানন্দ বেদান্ত ধর্ম প্রচার করতেন। বিদেশেও তিনি বেদান্তের পাঠ নিতেন। হিন্দুধর্মের বাইরের আচার-অনুষ্ঠানের গোঁড়ামি তিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু তখনকার ব্রাহ্মদের মত তিনি মূর্তি পূজার নিন্দা করেননি বরং সেটা মেনে নিয়েছিলেন। তবে সকল মানুষের সেবা, স্বদেশের সেবাকেই তিনি পরম ধর্ম বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন,

"বহুরূপে সম্মুখে তোমা ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর!
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

দেশের জন্য ও দেশের সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তিনি দেশের মানুষকে ডেকে বলতেন, "বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।" "ভুলিও না, তুমি জন্ম হইতে মায়ের বলিপ্রদত্ত—ভুলিও না, নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, আর্ত, মুচি, মেথর—তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

বিবেকানন্দের কাজ করবার ক্ষমতা ছিল অসীম। তিনি নাকি বলতেন, "আমার মত যদি একশ জন লোক পাই, তাহলে পৃথিবী উল্টে দিতে পারি।" তাঁর বাণী প্রচারের জন্য তিনি কয়েকটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার মধ্যে বেলুড়মঠের নাম তোমরা জান। দেশের জনসাধারণের সেবার জন্য তিনি যে রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গেছেন তা তাঁর দেশবাসীর প্রতি ভালবাসার কীর্তি আজও ঘোষণা করছে। এই প্রতিষ্ঠান বা মিশন-এর সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর সর্বত্র জনসেবার জন্য মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের কাজ নীরবে করে চলেছেন।

ভগিনী নিবেদিতা : বিবেকানন্দের অমৃতময় বেদান্তের বাণী শুনে অনেক বিদেশী ও বিদেশিনী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে মার্গারেট নোবেল নামে একজন আয়র্ল্যাণ্ডবাসী মহীয়সী মহিলাও ছিলেন। তিনি বিবেকানন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তাঁর নিজের দেশের সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে ভারতে চলে এলেন। শুধু তাই নয়, দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে তিনি ভারতবর্ষকে আপন দেশ বলে মেনে নেন। তখন থেকে ভারতবাসী হল তাঁর ভাই, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন ; আর তিনি ছিলেন সকলের ভগ্নী। ভারতের মঙ্গলের জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বলে বিবেকানন্দ তাঁর নাম দিয়েছিলেন নিবেদিতা। নারী হয়েও তাঁর সাজসজ্জায় কোনওরকম বাড়াবাড়ি ছিল না। তিনি পা পর্যন্ত ঝোলানো ধবধবে শাদা পোশাক পরতেন, আর গলায় থাকত রুদ্রাক্ষের মালা। কি সুন্দর দেখাত তাঁকে !



ভগিনী নিবেদিতা

বেলুড়মঠে তাঁর শিক্ষা সুরু হয়। স্বামীজীর সঙ্গে তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তারপর আরম্ভ হল স্বামীজীর বাণী প্রচারের কাজ । শুধু তাই নয়, ভারতের নারী ও আর্তদের মঙ্গলের জন্য তিনি নানা প্রকারের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি সহজ ও সরল ভাষায় সুন্দর বক্তৃতা দিতে পারতেন, লিখতেও পারতেন চমৎকার। তাঁর বক্তৃতা শুনে একজন বলেছিলেন, "প্রাচীন ঋষিদের কাহিনী শুনেছি, নিবেদিতা যেন তাঁদের একজন।"

নিবেদিতা বিশেষ করে আর্তের সেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। কলকাতায় একবার প্লেগের মহামারী লেগেছিল।

তিনি কোনওরকম দ্বিধা না করে এগিয়ে গেলেন সকল রুগীকে সেবা করে সারিয়ে তুলতে। একবার দারুণ বন্যা হল। তিনি গ্রামের পর গ্রাম নৌকোয় করে গ্রামবাসীদের কাছে পৌঁছে তাঁদের সেবা ও সাহায্যের ব্যবস্থা করলেন।

তিনি উত্তর কলকাতায় থাকতেন। পাড়ায় মেয়ে-বৌরা যাতে লেখাপড়া শিখতে পারে, যাতে তাদের কুসংস্কার দূর হয়, সেজন্য নিবেদিতা একটি স্কুল খুলেছিলেন। কিন্তু ছাত্রী হল না। কারণ কি? অভিভাবকগণ মনে করলেন, বিদেশিনীর সংস্পর্শে এসে বাড়ীর মেয়েরা খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু নিবেদিতা দমলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরই জয় হল। তখন থেকে তিনি 'ভগিনী নিবেদিতা' বলে জনসমাজে পরিচিত হলেন।

তাঁর নিজের দেশ আয়ার্ল্যাণ্ডও ভারতবর্ষের মত ইংরেজদের অধীনে ছিল। তাই তিনি পরাধীনতার দুঃখ বুঝতেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বাংলায় গুপ্ত সমিতি স্থাপন করতে তিনি তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

বিদেশিনী মেয়ে নিবেদিতা। বোধহয় তাঁর মত কোনও বিদেশিনা নারী ভারতবর্ষকে এত ভালবাসেনি, ভারতবর্ষের মানুষের এত সেবা করেনি, ভারতের স্বাধীনতার জন্যও এত ভাবেনি। তাঁর পবিত্র স্মৃতি আমাদের মন থেকে কখনই মুছে যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঃ পঁচিশে বৈশাখ বাংলার একটি শুভ দিন। সারা বাংলা সেদিন আনন্দে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। এই শুভদিনে রবীন্দ্রনাথ বাংলার কোলে জন্মগ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষা-দীক্ষায় ঠাকুরবাড়ী ছিল তখন শিক্ষিত বাঙালীর তীর্থস্থান। বাংলার খ্যাতনামা মনীষীরা এ বাড়ীতে এসে জড়ো হতেন। তাই বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশে বড় হয়েছিলেন

এবং নিজের প্রতিভায় বিশ্বকবিরূপে সকলের কাছে পরিচিত হন।

বিংশ শতাব্দীকে বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের যুগ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী এবং সেই একই সঙ্গে তাঁর শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ বাঙালীর মনে নতুন ভাবনা, নতুন আশা জাগিয়ে তুলেছে। তাঁর কাছ থেকে আমরা নতুন করে সাহিত্য রচনা করতে শিখেছি, শিখেছি নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে, আরও জেনেছি কেমন করে গ্রাম গঠন করতে হয়। মানুষের জীবনের এমন কোনও দিক নেই যে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেননি বা লিখে যাননি। তিনি ছিলেন মহামানব। তাঁরই লেখা 'জনগণমন অধিনায়ক' কবিতার প্রথমাংশটি স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

ভারতবর্ষের দুইজন মানুষকে পৃথিবীর প্রায় সকল লোকে চেনে—একজন হলেন মহাত্মা গান্ধী, আর একজন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের মনে কোনও রকম সঙ্কীর্ণতার স্থান ছিল না। তিনি যেমন ভারতবাসীদের ভালবাসতেন, তেমনি ভালবাসতেন বিশ্ববাসীকে। পূর্ব এবং পশ্চিম জগতের অধিবাসীরা যাতে কোন রকম বিবাদ-বিসম্বাদ না করে মিলেমিশে ভাবের আদানপ্রদান করতে পারে তার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এই কারণে তিনি এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকার মত বড় বড় দেশে গিয়ে সেখানকার বিখ্যাত মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করে তিনি সকলের কাছ থেকে শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁর লেখা 'গীতাঞ্জলি' কবিতাগুচ্ছের ইংরেজী অনুবাদ পড়ে তখনকার বিখ্যাত সাহিত্যিকগণ বিশেষ মুগ্ধ হন। তাই তাঁকে 'নোবেল' পুরস্কার দেওয়া হল। তিনি শুধু বাংলা বা ভারতের কবি নন, তিনি বিশ্বকবি। সেই সময়ে ভারত সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধি দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ দেশকে কত ভালবাসতেন সে কথা আমরা আগেই বলেছি। সেখানে কর্মী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনে তিনি যে নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন তা থেকে রবীন্দ্রনাথ যে কতবড় শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্ ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুদের মন কোনরকম বাধা না পেয়ে স্বাধীনভাবে যাতে সবকিছু শিখতে পারে সেজন্য তিনি একটি নতুন ধরনের বিদ্যালয় গড়ে তুললেন। সেখানে মুক্ত আকাশের নীচে গাছপালায় ঘেরা অঞ্চলে শিশুরা শিক্ষালাভ করত। তাদের জন্য রবীন্দ্রনাথ সহজ করে, সুন্দরভাবে নানারকমের বই লিখেছেন। তিনি নিজে এখানে পড়াতেন, আর তাঁকে সাহায্য করতেন তাঁরই বিশেষ পরিচিত আগ্রহী বন্ধুবান্ধব। ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে আসত। আমাদের এখনকার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও কিছুদিন এখানকার ছাত্রী ছিলেন।

এর প্রায় কুড়ি বছর পরে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বভারতী' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে দেশী-বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য শেখাবার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া ছবি আঁকা, নাচগান প্রভৃতি নানাবিধ চারুকলা শেখবার সুযোগও ছিল। এমন এক সময় ছিল যে এখানে বিদেশী বহু ছাত্র পড়তে আসতেন এবং বিদেশী অধ্যাপকগণও আগ্রহী হয়ে এখানে পড়াতে আসতেন। এইভাবে শান্তিনিকেতন তখন পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া শান্তিনিকেতনের কাছে সুরুল গ্রামে রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতন নামে এক পল্লী সেবাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। জাতীয় কংগ্রেসের কাজকর্ম অনেক সময়ই তাঁর পছন্দ হত না। গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর মতের অমিল হলে তিনি তা প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করতেন না। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'নাইট্' উপাধির সার্টিফিকেট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যা তিনি

নিজে একবার অন্যায় বলে মনে করতেন তা কখনই মেনে নিতেন না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁর আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হননি।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ঃ প্রাচীনকালে তপোবনের শান্ত পরিবেশে ঋষিরা শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। রবীন্দ্রনাথও কতকটা সেই আদর্শে তাঁর বিদ্যালয় দুটি গড়ে তুলেছিলেন। এর বহু পূর্বে উনিশ শতকে এদেশে আধুনিক ধরনে শিক্ষা দেবার জন্য অনেকগুলি স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। তারপর বি. এ., এম. এ. উপাধি দেবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিচিত ছিল। যাঁর দূরদর্শিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এটা সম্ভব হয়েছিল তিনি হলেন "বাংলার বাঘ" আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।


আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

অল্প বয়সে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে বিচক্ষণ আইন-ব্যবসায়ী হতে পেরেছিলেন এবং তারই ফলে শীঘ্রই বিচারপতির পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হয়েছিলেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই সদস্যপদে থেকে হাইকোর্টের কাজ সেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করতেন।

ইংরেজরা মনে করতেন যে বাঙালীরা বেশী শিক্ষিত বলে স্বাধীনতা আন্দোলনে এরাই বেশী যোগদান করে। বাংলাদেশে যাতে স্কুল-কলেজ আর না বাড়তে পারে সেইজন্য লর্ড কার্জন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে একটি আইন পাশ করেন। তিনি মনে করলেন, এতে শিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা আস্তে আস্তে কমে যাবে, স্বাধীনতা আন্দোলনও আর অগ্রসর হতে পারবে না। বাংলার নেতারা প্রতিবাদ জানালেন। এই

আইন পাশের পরের বছর আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে নিযুক্ত হলেন। তিনি কার্জনের আইন ভঙ্গ না করেও এমনভাবে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন যে, শিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা কমের দিকে না গিয়ে অনেক গুণ বেড়ে গেল।

প্রথমদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। এটি ছিল শুধু পরীক্ষা নেওয়া ও উপাধি দেবার একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। আশুতোষ আপ্রাণ চেষ্টা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলেন। তখনকার সময় উচ্চশিক্ষায় মাতৃভাষার কোনও স্থান ছিল না। আশুতোষই প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য পড়বার সুযোগ দিয়ে মাতৃভাষাকে উপযুক্ত সম্মান দেখালেন। তাছাড়া আইন ও বিজ্ঞান পড়বার জন্য দুটি কলেজ স্থাপন করে তিনি আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অভাব মিটিয়েছিলেন। বহু বাঙালী ও অবাঙালী সুপণ্ডিত অধ্যাপক নিযুক্ত করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে গড়ে তুললেন। এই সকল অধ্যাপকদের গবেষণার জন্য এবং নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে আশুতোষ সর্বদাই উৎসাহ দিতেন।

প্রথমবার একনাগাড়ে আট বছর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তারপর আরও দু'বছর তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। এরপরও বাংলার গভর্ণর তাঁকে আর একবার উপাচার্যের পদ দিতে চাইলেন। কিন্তু একটি শর্ত ছিল যে সরকার যা বলবেন তাঁকে তাই করতে হবে। আশুতোষ এই প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যদের কাছে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করে বলেছিলেন, "আমার কাছে আমার স্বাধীনতাই প্রথম, দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ কথা"। তাঁর তেজস্বিতার জন্য বাংলার মানুষ তাঁকে "বাংলার বাঘ" আখ্যা দিয়েছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করবার ব্যবস্থা হবার আগে প্রেসিডেন্সি কলেজে সবচাইতে ভালভাবে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

তাই বাংলার অনেক নাম করা মানুষ এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। আবার অনেকে অধ্যাপনাও করেছেন। এইরকম দুজন বাঙালী অধ্যাপক বিজ্ঞান জগতে শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছিলেন। এঁদের নাম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

জগদীশচন্দ্র বসু ঃ সে সময়ে গবেষণা করা সহজ ছিল না। এজন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তাঁর নিজের গবেষণাগার গড়ে তুলেছিলেন। প্রথমে তিনি বেতার আবিষ্কারে মন দিলেন। তার চেষ্টাও প্রায় সফল হয়ে আসছিল। এই সময়ে মারকনি নামে ইটালী দেশের একজন বৈজ্ঞানিক ঐ একই বিষয়ে গবেষণা করছিলেন। [জগদীশচন্দ্রের] আগেই মারকনি তাঁর গবেষণার ফল প্রকাশ করে দিলেন। কাজেই "বেতার" আবিষ্কারের সব কিছু



আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

কৃতিত্ব মারকনি পেলেন। এ বিষয়ে জগদীশচন্দ্র তাঁর পরিশ্রমের পুরস্কার না পেয়ে নিরাশ হলেন কিন্তু দমলেন না। তিনি গাছপালা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি তাঁর নিজের তৈরী যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রমাণ করলেন যে অন্যান্য জীবজন্তুর

মত গাছপালারও প্রাণ আছে। তারাও ঘুমোয়, তারাও জাগে, তাদেরও খিদে পায়, আঘাত করলে তাদেরও ব্যথা লাগে। এই আবিষ্কারের কথা জানার পর সমস্ত বিজ্ঞান-জগতে হুলুস্থূল পড়ে যায়। জগদীশচন্দ্র ঘুরে ঘুরে, বক্তৃতা করে. নানা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে তাঁর আবিষ্কারের বার্তা পৌঁছে দিলেন। তখন অনেকেই তাঁকে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলে স্বীকার করে নিলেন। জগদীশচন্দ্র কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়ীতে একটি গবেষণাগার স্থাপন করেছিলেন। এখন এর নাম 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন রসায়নশাস্ত্রে পণ্ডিত। প্রাচীন যুগে হিন্দুরা রসায়নশাস্ত্রে কি রকম উন্নত ছিল সে সম্বন্ধে একখানি বই লিখে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। "বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তিনি অক্ষয় কীর্তিলাভ করেছেন।

বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। তখনকার দিনে নানাপ্রকার সাবান, সুগন্ধি, ঔষধ প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বিদেশ থেকে আমাদের দেশে আমদানী করা হত। বিদেশীরা এভাবে আমাদের শোষণ করছে মনে করে প্রফুল্লচন্দ্র খুবই দুঃখ পেতেন। মাত্র আঠাশ টাকা হাতে নিয়ে তিনি কাজে নেমে পড়লেন। তাঁর নিজের চেষ্টায় ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশঃ বড় হতে লাগল, লাভও হল প্রচুর। শেষে প্রফুল্লচন্দ্র দেশের মঙ্গলের জন্য এই প্রতিষ্ঠান থেকে নিজের সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিলেন। এমনই ছিল তাঁর স্বার্থত্যাগ।

গান্ধীজীর আন্দোলনে প্রফুল্লচন্দ্র এগিয়ে এলেন। তিনি চরকা কাটতেন, খদ্দর পরতেন, অপরকেও এ কাজে উৎসাহ দিতেন। দুর্ভিক্ষ, ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যার সময় তিনি মুক্তহস্তে দান করতেন। প্রয়োজন হলে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে তিনি কুণ্ঠা বোধ

করতেন না। তাঁর সহজ ও সরল জীবন-যাপন থেকে বাংলার মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে শিখেছিল।

অশ্বিনীকুমার দত্তঃ ওপরে যে দুজনের কথা বলা হল তাঁরা জ্ঞানের গভীরতার জন্য দেশবাসীর হৃদয় জয় করেছিলেন। এখন এমন একজনের নাম বলব যিনি তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা ও অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে দেশবাসীর সেবা করে গেছেন। এঁর নাম অশ্বিনীকুমার দত্ত। তাঁকে "বরিশালের মুকুটহীন রাজা" বলা হত। তাঁর কথায় বরিশালের সমস্ত মানুষ, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল উঠত বসত বললে খুব অন্যায় বলা হয় না। কেন দেশবাসী অশ্বিনীকুমারকে এত শ্রদ্ধা করত? তিনি যে ধনী ছিলেন তা নয়; তিনি যে আগুন জ্বালান বক্তৃতা করতে পারতেন তাও নয়; তাঁকে সকলে মান্য করবার কারণ ছিল তিনি যেভাবে জনসাধারণের দুঃখকষ্ট বুঝতে পারতেন তেমন করে খুব কম লোকই বুঝত। তিনি সকলের সঙ্গে অবাধে মিশতেন, তাদের কথা ভাবতেন, এবং কথায় ও কাজে তাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতেন। হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র একইভাবে তাঁর সাহায্য পেত, তাঁর সেবা পেত।



অশ্বিনীকুমার দত্ত

স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি বরিশালবাসীদের বিদেশী দ্রব্য বর্জন করতে বললেন। সকলে তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গ্রামে গ্রামে গঠিত হল তাঁরই আদেশে। এদের চেষ্টায় বাজার থেকে বিলাতী জিনিস একেবারে উঠে গেল, এমনকি জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটও বরিশালের বাজারে বিদেশী জিনিস কিনতে পারতেন না। এর জন্য সেখানকার মানুষদের সরকারের হাতে নানা অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত অশ্বিনীকুমারকে বরিশাল থেকে লাহোরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখা হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের পর দেশে যত আন্দোলনের ঢেউ এসেছিল, অশ্বিনীকুমার মৃত্যু পর্যন্ত এগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বরিশালের শিক্ষা-প্রসারের জন্য তিনি একটি স্কুল ও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে সেদিনকার বরিশাল সমগ্র বাংলার কাছে আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র বসু ঃ সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেমের কথা তোমরা আগেই জেনেছ। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন তাঁর শেষ পর্যন্ত সফল না হলেও তিনি দেশে থাকাকালে যা করেছিলেন তাও কিছু কম নয়।

তিনি ছিলেন ধনীর দুলাল। বিলেত থেকে আই. সি. এস. পাশ করে দেশে ফিরে এলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে সুভাষচন্দ্র সাড়া না দিয়ে পারলেন না। এইরকম অত্যাচারী ইংরেজের অধীনে কাজ করতে তাঁর ঘৃণাবোধ হল। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে নেমে পড়লেন।

সুভাষচন্দ্রের ত্যাগে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে চিত্তরঞ্জন তাঁকে দলে টেনে নিলেন। দুজনে একত্রে দেশের কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এজন্য বহুবার তাঁকে জেলে পুরে রাখা হয়। এমন কি ভারতের বাইরে ব্রহ্মদেশেও তাঁকে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। দেশসেবার আহ্বান জানিয়ে সুভাষচন্দ্র যে বক্তৃতা করতেন সেই ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার বহু তরুণ তাঁকে নেতা বলে বরণ করে নিয়েছিল।

দেশবন্ধুর যখন মৃত্যু হল তখন দেশে দলাদলি আরম্ভ হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্র তাঁর স্থান পূর্ণ করে আবার ঐক্য ফিরিয়ে আনলেন। তরুণ দেশকর্মীরা চাইতেন ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে 'পূর্ণ স্বরাজ' লাভ করতে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি বড় বড় নেতারা সেটা পছন্দ করতেন না। শেষপর্যন্ত জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্রের

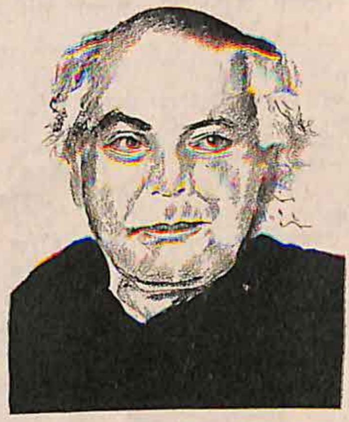
চেষ্টায় সকলেরই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী মেনে নিতে হয়েছিল। যেদিন একথা ঘোষণা করা হল সেদিনের তারিখ ছিল ২৬শে জানুয়ারী, ১৯২৯ সাল। আজও আমরা এই দিনটিকে স্মরণ করে 'সাধারণতন্ত্র দিবস' পালন করে থাকি।

এর কিছুদিন পর গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। সুভাষচন্দ্রও এতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার বিষয়ে তিনি কিছুতেই গান্ধীজীর মত মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর মত ছিল, দেশে পূর্ণ স্বাধীনতা আনতে হলে ইংরেজের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে যেতেই হবে। কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য তাঁর এই মত সমর্থন করলেন। ফলে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েও গান্ধীজীর কাছ থেকে সাড়া পেলেন না। গান্ধীজী তাঁর জয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন মনে করে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের দল থেকে নিজেকে আলাদা করে একটি নতুন দল গঠন করলেন ; নাম দিলেন 'ফরওয়ার্ড ব্লক'।

গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করলেও সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের পথকে বেছে নিয়েছিলেন। 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' গঠন করে তার কথা ও কাজকে তিনি সত্যে পরিণত করতে পেরেছিলেন। অসুস্থ অবস্থায় ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে বিদেশীর সাহায্যে নিজের দেশে স্বাধীনতা আনবার যে অক্লান্ত চেষ্টা তিনি করেছিলেন তা আমরা কখনই ভুলব না।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ সুভাষচন্দ্রের কর্মময় জীবনের প্রেরণা ছাড়াও বহু বিপ্লবী লেখকের কবিতা ও গান তরুণদের মনে উৎসাহের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। এমনিই একজন ছিলেন কাজী নজরুল ইস্‌লাম। নজরুল তাঁর কাব্যে দেশের পরাধীনতার কথা, দুঃখীর দুঃখের কথা, সাধারণ মানুষের বেদনার কথা এমন দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে বাংলার মানুষ তাঁর নাম দিল 'বিদ্রোহী কবি।'

দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে প্রকাশ পেয়েছিল নজরুলের কাব্য-প্রতিভা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলার তরুণদের মনে যে অশান্তি অস্থিরতা ও বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়েছিল নজরুলের লেখায় তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গেল। ‘চল্ চল্ চল্, ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল্‌রে চল্‌রে চল্” গানটি তরুণদের প্রাণ মাতিয়ে দিয়েছিল। শুধু কবিতা নয়, অজস্র গান, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি দেশবাসীর সেবা করেছেন। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার লেখনী রুখে দাঁড়াল। বাংলার গণ-জাগরণের গোড়ায় সবচেয়ে বেশী কাজ হয়েছিল তাঁর ‘অগ্নিবীণার’ ঝংকারে। তখনকার ইংরেজ সরকার তাঁর লেখা এই কাব্যগ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে ছমাসের জন্য জেলে পুরে রাখলেন। তবু তাঁকে কেউ দমিয়ে রাখতে পারেনি। তিনি গেয়ে উঠলেন, “শিকল পরা ছল মোদের, এই শিকল পরা ছল, শিকল পরেই শিকল তোদের করবোরে বিকল।” এই মুখর কবি আজ মূক হয়ে গেছেন, তিনি অসুস্থ, কিন্তু দেশের মানুষ তাঁরই গানে তাঁর জয়ধ্বনি এখনো ঘোষণা করে।



কাজী নজরুল ইসলাম

আবুল কাশেম ফজলুল হকঃ ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও শক্তিশালী নেতা ছিলেন আবুল কাশেম ফজলুল হক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই তিনি বঙ্গদেশের রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের যাতে উন্নতি হয় তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতেন। এইজন্য তিনি মুস্লিম লীগের প্রতিষ্ঠায় বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর মনে কোন

রকম সাম্প্রদায়িকতার স্থান ছিল না। হিন্দুদের দুঃখদুর্দশা তিনি সমান ভাবে অনুভব করতেন। এই মুশ্লিম লীগের সদস্য থাকাকালীন তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হয়েছিলেন। এমনকি তিনি কিছুকাল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকরূপেও কাজ করেছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি তাঁর কোনরকম সহানুভূতি ছিল না। তখন থেকে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করেন।

এদিকে মুশ্লিম লীগের নেতাদের সঙ্গেও ক্রমে তাঁর প্রবল মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। ১৯৩৭ সালে তিনি "কৃষক প্রজা পার্টি" নাম দিয়ে একটি নূতন দল গঠন করেন। একই বছরে তিনি মুশ্লিম লীগকে পরাজিত করে বাংলাদেশের আইন সভার নির্বাচনে জয়লাভ করলেন। এরপর তাঁর দলের সঙ্গে একত্র হয়ে বাংলাদেশের মন্ত্রী-সভা গঠন করবার জন্য তিনি কংগ্রেসের নেতাদের অনুরোধ করলেন। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এতে রাজী হলেন না। তাই তিনি মুশ্লিম লীগের সঙ্গে একত্র হয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। হক সাহেব এতে খুশি হতে পারেননি। তাই কয়েক বছর পরে তিনি আবার নূতন করে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। এবার কংগ্রেসের সদস্যরাও তাঁর সঙ্গে যোগদান করলেন। কিন্তু মুশ্লিম লীগের প্ররোচনায় ইংরেজ সরকার এই মন্ত্রীসভা ভেঙে দেন। এরপর মুশ্লিম লীগের নেতা সুরাবর্দী সাহেবের নেতৃত্বে আবার এক নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, এবং মুসলমানদের মধ্যে মুশ্লিম লীগের প্রভাব ক্রমে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে পূর্ব-পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়েছিল।


ফজলুক হক

পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্টি হবার পর হক সাহেব ঢাকা চলে যান। সেখানে মুশ্লিম লীগের নেতাদেরই প্রাধান্য ছিল। এই সময় হক

সাহেব "কৃষক শ্রমিক পার্টি" নাম দিয়ে নিজের দল গঠন করেন। ১৯৪৫ সালে একাশী বছর বয়সে তিনি লীগকে পরাজিত করে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন। এই সময়ে তিনি পশ্চিম বাংলার সঙ্গে সহযোগিতা কামনা করেছিলেন। কলকাতাতে একটি বক্তৃতাতে তিনি বলেন, "বাঙালী এক অখণ্ড জাতি, তাঁরা একই ভাষায় কথা বলে, তাদের আদর্শ এক, এবং জীবনধারণের পদ্ধতিও এক। দেশবিভাগ সত্ত্বেও দুই বাংলা মিলিতভাবে সারা দেশকে পথ দেখাতে পারে।" হক সাহেবের কার্যকলাপ দেখে মুস্লিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে দারুণ আশঙ্কা দেখা দেয়। তাদের চেষ্টায় হক সাহেবের মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়া হল এবং তাঁকে দেশদ্রোহী বলে গৃহবন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে পরে তাঁকেই পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর রূপে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁকে পদচ্যুত করা হল। এর কয়েক বছর পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

হক সাহেব ছিলেন একজন দিলখোলা, দরদী, সরল প্রকৃতির মানুষ। তাঁর গৃহদ্বার ধনীদরিদ্র সকলের কাছে উন্মুক্ত থাকত। এইজন্য তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করতে পেরেছিলেন। তিনি যখন যুক্তবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন ভূমি-সংক্রান্ত একটি আইন প্রণয়ন করে বঙ্গদেশের কৃষকদের দুঃখদুর্দশা দূর করবার চেষ্টা করেন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার জন্য লোকে তাঁকে "শের-ই-বঙ্গাল" উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ঃ পরাধীন ভারতবর্ষের দুর্দশা ঘোচাবার জন্য যেসব মহামানব জীবনপাত করে গেছেন এতক্ষণ আমরা তাঁদেরই বন্দনা করলাম। এবার এমন একজনের নাম উল্লেখ করব যিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন, আবার স্বাধীনতা লাভ করবার পর দেশগঠনের কাজেও একজন প্রকৃত যোদ্ধার পরিচয় দিয়েছিলেন। এঁর নাম বিধানচন্দ্র রায়। দেশ স্বাধীন হবার পর

জাতি গঠন করবার যে অজস্র কাজ বাকী পড়ে ছিল তা তিনি খুব ভাল করে বুঝতে পেরেছিলেন।


ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়

বিধানচন্দ্র প্রথমে ভারত-বর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎ-সক বলে পরিচিত হন। বহু চিকিৎসাকেন্দ্রের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় চিকিৎসা ব্যাপারে অনেক উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মত শক্তিধর পুরুষ শুধু ডাক্তারী নিয়েই সন্তুষ্ট রই-লেন না। গান্ধীজীর অসহ-যোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কারাবরণ করলেন। তিনি কংগ্রেসের কাজেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মত বিখ্যাত নেতাকে পরাজিত করে তিনি বাংলার বিধান-সভার সদস্য হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি কর্পোরেশনের মেয়রের পদ লাভ করলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যের পদ অলংকৃত করলেন এবং নিজের প্রতিভায় আরও অনেক সম্মান লাভ করলেন। যখনই যে পদে থাকুন না কেন, বিধানচন্দ্র দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন।

দেশ স্বাধীন হবার কিছুকাল পরে বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন। ক্ষমতা হাতে পেয়ে তিনি দেশের জনসাধারণের দুঃখ ঘোচাবার কাজে এগিয়ে আসেন। চৌদ্দ বছর ধরে তিনি নানা-ভাবে দেশসেবা করেছেন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ক্যান্‌সার হাস-পাতাল, যাদবপুর হাসপাতাল সবই তাঁরই উৎসাহে ও সাহায্যে আজ এত বড় প্রতিষ্ঠান রূপে পরিণত হতে পেরেছে। চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি

ছাড়া তিনি আরো কতকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাঁরই চেষ্টায় চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ স্থাপিত হয়। এখানে লৌহজাত ইঞ্জিন, রেলগাড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। তিনি দুর্গাপুর লৌহকারখানায় লোহা প্রস্তুত করবার যন্ত্রপাতি বসিয়ে দেশের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করলেন। খড়গপুরে আই. আই. টি. নামে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও তারই উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হল। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যে আজ এত বড় হয়েছে তারও মূলে ছিলেন বিধানচন্দ্র। সিন্ধ্রী সার কারখানা এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনও তাঁরই কীর্তি।

সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করে সফলতা লাভ করা ছিল বিধানচন্দ্রের জীবনের উদ্দেশ্য। জীবনের শেষ চৌদ্দ বছর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদে থেকে তিনি তাঁর দেশগঠনের কাজ ভালভাবেই সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

আবার বঙ্গভঙ্গ

স্বাধীনতার জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যে আন্দোলন করেছিল তার লক্ষ্য ছিল ভারতের সকল অধিবাসীকে ইংরেজদের শাসন থেকে মুক্ত করা ; এতে ভারতের বিভিন্ন জাতি বা ধর্মকে আলাদা করে দেখা হয়নি। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে অনেক বড় বড় মুসলমান নেতাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ মুসলমানই এর থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তারা শিক্ষায়-দীক্ষায় এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে হিন্দুদের চাইতে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে বলে নিজেদের অসহায় মনে করত। এই সময় হিন্দুরাই বেশীর ভাগ বড় বড় চাকুরীতে অধিষ্ঠিত ছিল। জমিজমার মালিকানাও বেশীর ভাগ তাদের হাতে ছিল। এইজন্য কয়েকজন মুসলমান নেতার মনে ভয় হল যে ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপারে ইংরেজদের ক্ষমতা কমে গেলে বেশীসংখ্যক হিন্দু কমসংখ্যক মুসলমানদের উপর প্রভুত্ব করতে সুবিধা পাবে। এই কারণে স্যার সৈয়দ আহম্মদ নামে একজন বিখ্যাত নেতা ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে নিজেদের শিক্ষার মান উন্নত করবার জন্য মুসলমানদের পরামর্শ দিলেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলমানদের জন্য তিনি একটি কলেজ স্থাপন করেন, আজ সেটি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। শুধু তাই নয়, স্যার সৈয়দ আরও বললেন যে হিন্দু-মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি, কাজেই তাদের জন্য অনেক বিষয়ে ভিন্ন ব্যবস্থা থাকা দরকার।

এর পর থেকে মুসলমানদের নিজস্ব স্বার্থরক্ষা করাই তাদের অধিকাংশ নেতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তাঁরা 'মুস্লিম লীগ' নামে পৃথক দল গঠন করেন। তারপর

তাঁরা সকলকে জানিয়ে দিলেন যে মুসলমানদের পক্ষ থেকে একমাত্র এই লীগেরই কথা বলার অধিকার আছে, কংগ্রেসের নেই। ইংরেজরা দেখল এ একরকম ভালই হল। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যদি কোনও একতা না থাকে তাহলে স্বাধীনতা আন্দোলন আর জোরদার হতে পারবে না। তাই ইংরেজ সরকার মুসলমানদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য তাদের নানা রকম সুখ-সুবিধার দিকে একটু বেশী নজর দেন। বঙ্গভঙ্গ হবার পর নতুন পূর্ববঙ্গ ও আসামের লাটসাহেব সোজাসুজি বলেছিলেন, "মুসলমানরা আমার সুয়োরানী আর হিন্দুরা হল দুয়োরানী।"

মুস্লিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনেক উচ্চশিক্ষিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মনে করে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু অন্য মুসলমানগণ কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিল না। তারা দেশ-শাসন ব্যাপারে নিজেদের সুবিধা আদায় করার জন্য দাবী জানাতে লাগল। ইংরেজ সরকার এইসব দাবীর অনেকগুলিই পূরণ করেছিলেন।

ক্রমে মুসলমান নেতারা বলতে শুরু করলেন যে তাঁরা আলাদা জাতি। তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতীয় হিন্দুদের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। তাই ভারতবর্ষকে যদি স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয় তবে তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে থাকবেন না; মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। তাঁরা দুটি পৃথক প্রদেশ গঠন করতে চাইলেন। এর একটি হবে পঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান ও কাশ্মীর নিয়ে গঠিত; আর একটিতে থাকবে বঙ্গদেশ ও আসাম। এই যে দুটি আলাদা প্রদেশ ভারতবর্ষ থেকে ভাগ করে নেওয়া হবে তাতে শাসনক্ষমতা কেবলমাত্র মুসলমানদের হাতে দিতে হবে। কংগ্রেস কিছুতেই হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি একথা মেনে নিতে পারেনি আর ভারতবর্ষকে এইভাবে ভাগ করতেও স্বীকার করেনি।

এইভাবে যখন নানা বিষয় নিয়ে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানরা নিজ

নিজ স্বার্থরক্ষার কথা ভাবছিলেন তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। এই সময়ে দিল্লীর বিখ্যাত লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কয়েকজন নেতার ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপরাধে বিচার আরম্ভ হয়। এর প্রতিবাদে ভারতের সর্বত্র দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। শুধু দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেই নয়, ইংরেজদের অধীনে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেও তখন এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ নেতাজীর 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজদের অধীনতা থেকে দেশ মুক্ত করার আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল। দেখা গেল, ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি দল হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসল। শুধু তাই নয়, ভারতীয় বিমানবাহিনী ধর্মঘট শুরু করল। এইবার ইংরেজরা মুস্কিলে পড়ল। কারণ এতদিন তারা ভারতীয় সৈন্য এবং পুলিশের সাহায্যেই রাজ্যশাসন করছিল, এরাই ছিল ইংরেজদের বলভরসা। এতদিন পরে সেটা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল। ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝতে পেরে ইংলণ্ড থেকে তিনজন মন্ত্রী চলে এলেন ভারতীয়দের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে।

আলাপ-আলোচনার পর ইংরেজরা বুঝতে পারল যে ভারতীয়দের আর দমন করা চলবে না। তাদের স্বাধীনতা দিতেই হবে। তাই তাঁরা ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করলেন। তখন মুসলমানরাও তাদের পৃথক রাষ্ট্র 'পাকিস্তান-এর' দাবী তুলে ধরল। শুধু দাবীই নয়, একজন মুসলমান নেতা বললেন যে ইংরেজরা যদি তাদের দাবী পূরণ না করেন তবে তাঁরা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু করবেন।

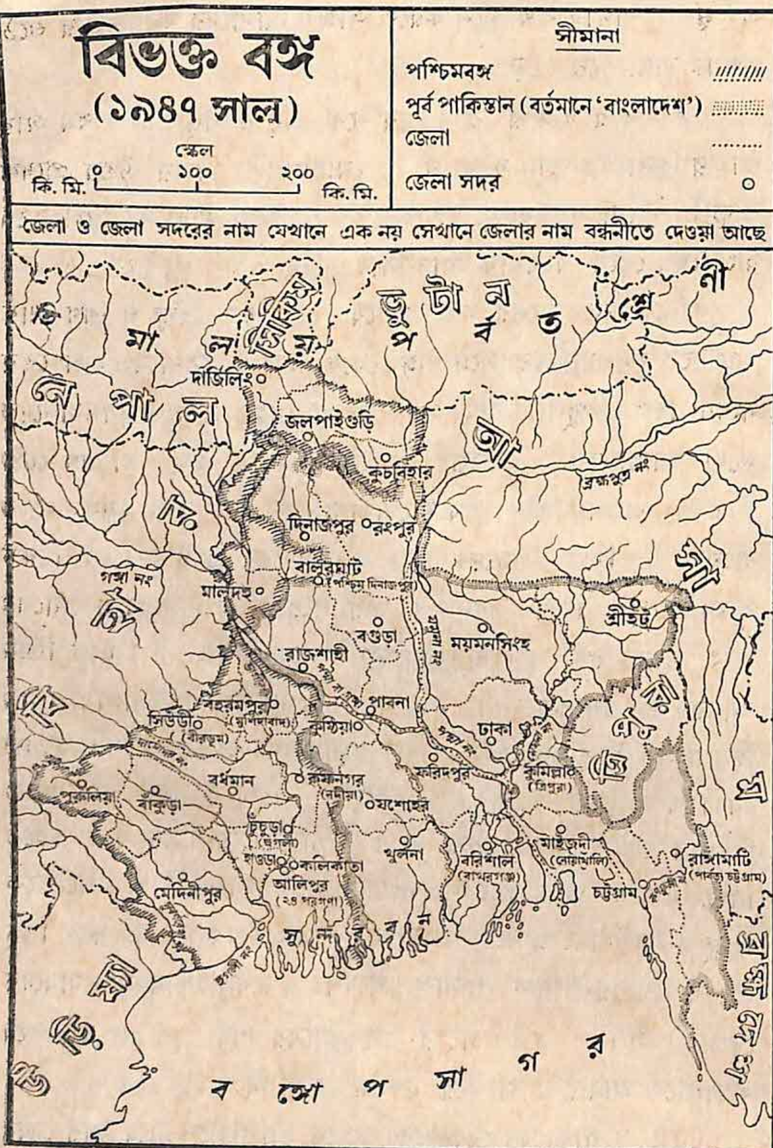
মুসলমান নেতারা ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন বলে ঘোষণা করেন। সেদিন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড দাঙ্গা বেধে যায়। উভয় দলেরই বহু মানুষ হতাহত হল। কলকাতাতেই সবচাইতে বেশী দাঙ্গা হয়েছিল। চারদিনে উভয় সম্প্রদায়ের চার হাজার মানুষ মারা গেল এবং প্রায় পনেরো হাজার আহত হল।

এই নৃশংস দাঙ্গার কথা মনে করলে আজও আমাদের মন শিউরে ওঠে, লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়ে।

কলকাতার দাঙ্গার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন আর কারুর হিতাহিত জ্ঞান রইল না। নোয়াখালি, বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি স্থানের বহু মানুষ হতাহত হল। বিষয়-সম্পত্তি ফেলে দিয়ে বাংলাদেশ থেকে বহুলোক প্রাণ নিয়ে এদিক ওদিক পালিয়ে গেল।

এদিকে বাংলাদেশের মত পাঞ্জাবেও একদিকে হিন্দু ও শিখ আর অন্যদিকে মুসলমানদের সঙ্গে দাঙ্গা বেধে গেল। সেখানেও হতাহতের সংখ্যা ছিল বিপুল। এই সময় মহাত্মা গান্ধী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে আবার শান্তি ও বন্ধুত্ব ফিরিয়ে আনবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি প্রথমে নোয়াখালীতে যান এবং মুসলমানদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে হিন্দুদের প্রতি সুব্যবহারের জন্য তাদের নিকট করুণ ভাবে আবেদন জানান। এর পরে তিনি কলকাতা আসেন এবং স্থির করেন যে হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে বিবাদ না মিটলে তিনি আমরণ উপবাস করবেন। এর ফলে বাংলাদেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেমে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে এইসব জঘন্য হত্যাকাণ্ড দেখে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাগণ অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমানদের সমস্যা চিরতরে মেটাবার জন্য তাঁরা আর দেশবিভাগের বিরোধিতা করতে চাইলেন না। তাঁরা বললেন, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব এই দুটি প্রদেশকে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোক। এর ফলে সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান মুসলমানদের দেওয়া হল। এতে তাদের পাকিস্তানের দাবী পূর্ণ হল বটে তবে বাঙালীকে আবার নতুন করে 'বঙ্গভঙ্গ' মেনে নিতে হল।

বাংলা ও পাঞ্জাবের কোন্ কোন্ অংশ পাকিস্তানে যাবে আর কোন্ কোন্ অংশ ভারতবর্ষের মধ্যে থাকবে তা স্থির করবার জন্য একটি 'সীমানা কমিশন' গঠিত হল। ইংরেজরা র‍্যাডক্লিফকে এর সভাপতি নিযুক্ত করলেন। কিভাবে ভাগ হবে তা নিয়ে কমিশনের হিন্দু ও


বিভক্ত বঙ্গ
(১৯৪৭ সাল)
স্কেল
কি. মি. ০ ১০০ ২০০ কি. মি.
সীমানা
পশ্চিমবঙ্গ
পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে 'বাংলাদেশ')
জেলা
জেলা সদর
জেলা ও জেলা সদরের নাম যেখানে এক নয় সেখানে জেলার নাম বন্ধনীতে দেওয়া আছে
ভুটান
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
কুচবিহার
ব্রহ্মপুত্র নং
দিনাজপুর
রংপুর
বালুরঘাট
(পশ্চিম দিনাজপুর)
মালদহ
গঙ্গা নং
বগুড়া
ময়মনসিংহ
শ্রীহট্ট
রাজশাহী
বহরমপুর
(মুর্শিদাবাদ)
পাবনা
সিউড়ী
(বীরভূম)
কুষ্টিয়া
ঢাকা
কুমিল্লা
(ত্রিপুরা)
বর্ধমান
কৃষ্ণনগর
(নদীয়া)
ফরিদপুর
যশোহর
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
চুঁচুড়া
(হুগলী)
খুলনা
বরিশাল
(বাখরগঞ্জ)
মাইজদী
(নোয়াখালি)
রাঙ্গামাটি
(পার্বত্য চট্টগ্রাম)
হাওড়া
কলিকাতা
আলিপুর
(২৪ পরগণা)
মেদিনীপুর
চট্টগ্রাম
সুন্দরবন
ব ঙ্গো প সা গ র

মুসলমান সভ্যরা কোনপ্রকারেই একমত হতে পারলেন না। তখন সীমানা নির্ধারণের ভার পড়ল এই র‍্যাডক্লিফের উপর।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাংলার দুই অংশকে একত্র করে যে বাংলাদেশ গঠন করা হয়েছিল তার উত্তরে ছিল নেপাল, সিকিম, ভুটান আসামের গোয়ালপাড়া জেলা ও গারো পাহাড়; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পূর্বে আসামের শ্রীহট্ট জেলা ও লুসাই পাহাড়; পশ্চিমে বিহারের পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগনা, মানভূম প্রভৃতি জেলা ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও বালেশ্বর জেলা।

র‍্যাডক্লিফ এবার বাংলাদেশকে যেভাবে ভাগ করলেন তাতে সমগ্র বর্ধমান বিভাগ, রাজসাহী বিভাগের দার্জিলিং জেলা, ভারতের অংশে পড়ল। এছাড়া নদীয়া, যশোহর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদহ জেলাগুলিও ভাগ করে কিছুটা পশ্চিমবঙ্গ ও কিছুটা পূর্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হল। তাছাড়া আসাম থেকে শ্রীহট্ট জেলাটিও কেটে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

র‍্যাডক্লিফের বাংলা বিভাগ এমনভাবে হল যে তাতে কোনও প্রাকৃতিক সীমানা রইল না। যেসব অঞ্চলে বেশীসংখ্যক হিন্দু বাস করত সেগুলি পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যুক্ত হল; আবার বেশীসংখ্যক মুসলমান বাস করছে এমন সব অঞ্চলগুলিকে ভারতবর্ষের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। বাংলার এই দুই অংশের মধ্যে যাতে সর্বদা সীমানা নিয়ে গণ্ডগোল থাকে এবং দুই ভাগের বাঙালীদের মধ্যে যাতে কোনও সদ্ভাব না থাকে সম্ভবতঃ তাই ছিল র‍্যাডক্লিফের মনের ইচ্ছা। মোটের উপর বাংলাকে যেভাবে ভাগ করা হল তাতে, কি হিন্দু কি মুসলমান, কেউই খুশি হতে পারল না।

নবম অধ্যায়

বাংলাদেশের উদ্ভব

ভারতবর্ষকে টুকরো করে পাকিস্তানের সৃষ্টি হল। সে দেশের নেতারা ভেবেছিলেন যে তাঁরা নিজেদের ইচ্ছামত তাঁদের দেশ গড়ে তুলে সুখে-শান্তিতে বসবাস করবেন। কিন্তু তাঁদের মস্ত বড় ভুল হয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে এক মুসলমান ধর্ম ছাড়া অন্য কোন বিষয়েই মিল ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষদের আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি কিছুর সাদৃশ্য নেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষদের সঙ্গে। আরও দেখা গেল যে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল মানুষ, বিশেষ করে পাঞ্জাবীরা, বড় অহঙ্কারী। তারা মনে করত যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের চেয়ে শিক্ষা-দীক্ষায় ও আচার-ব্যবহারে তারা অনেক বেশী উন্নত, আর শাসন-বিষয়ে তারা যেমন বোঝে বাঙালী মুসলমান সেরকম বোঝে না। এতে শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ দেখা দিল। তার ফলে প্রথম থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম দুই পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে মন-কষাকষি চলতে লাগল।

মুস্লিম লীগের চেষ্টায় পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই স্বাধীনতা লাভের পর প্রথমে এই দলের নেতারাই দেশ শাসন করতে থাকে। তখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের যত বড় বড় চাকুরী ছিল সবই পাঞ্জাবী-দের দেওয়া হতে লাগল। ফল হল এই যে ইংরেজ রাজত্বের অবসানের পরও কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে পাঞ্জাবী রাজত্ব কায়েম হল। এখানকার সমস্ত সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানীরা দু'হাতে লুটতে লাগল।

এদিকে পূর্ব পাকিস্তানীদের অসন্তোষ দিনে দিনে বেড়েই চলছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির মাস ছয়েক পরে পাকিস্তানের সর্বময় কর্তা কায়েদ-ই-

আজম জিন্না সাহেব পূর্ব পাকিস্তানে বেড়াতে এলেন। সে সময়ে পাকিস্তানীদের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তাই নিয়ে কাথাবার্তা চলছিল। পশ্চিম পাকিস্তনীরা চাইল শুধু উর্দুভাষা কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা চাইল বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিরাট সভায় জিন্না সাহেব ঘোষণা করলেন যে শুধু উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করা হবে। সভার মধ্যে একটি জোরালো গলায় এর প্রতিবাদ শোনা গেল। সেদিন মনে অদম্য সাহস নিয়ে যিনি বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করবার জন্য সর্ব শক্তিমান জিন্নার মুখের উপর প্রতিবাদ জানাতে পেরেছিলেন তাঁর নাম শেখ মুজিবর রহমান —আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের স্রষ্টা, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।

পাকিস্তান সৃষ্টি হবার আগে মুজিবর কলকাতার ইস্‌লামিয়া কলেজের (এখন নাম হয়েছে মৌলানা আজাদ কলেজ) ছাত্র ছিলেন। সেই সময়েও তিনি মুসলমান ছাত্রদের নেতা ছিলেন। তিনি মুশ্লিম লীগের কাজকর্ম সমর্থন করতেন। তাছাড়া তখনকার যুক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেবের শিষ্য ছিলেন শেখ মুজিবর। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর মুজিবর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতে চলে গেলেন। সেখানেও তিনি ছাত্রনেতা হলেন। মুজিবর যদিও মুশ্লিম লীগের সভ্য ছিলেন তবুও শুধুই বিত্তবানদের স্বার্থরক্ষা করতে তাঁর মন চাইল না। কারণ সেই সময়ে মুশ্লিম লীগ দেশের গরীব-দুঃখীদের কথা বিন্দুমাত্রও চিন্তা করত না। এতে খুব দুঃখিত হয়ে তিনি এবং তাঁর প্রিয় নেতা সুরাবর্দী সাহেব এবং আরও অনেকে মুশ্লিম লীগ ত্যাগ করে একটি নতুন দল গঠন করলেন, নাম দিলেন 'আওয়ামী লীগ।' ক্রমে শেখ মুজিবর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি হলেন।

এদিকে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে, এই দাবী নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র ভীষণ আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। এতে প্রধানতঃ পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররাই বেশী সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল।

এদের দমন করতে গিয়ে পুলিশ গুলি ছুঁড়ল। ঢাকার রাজপথ তরুণ শহীদদের রক্তে লাল হয়ে গেল। এই দিনটি ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারী।

সেই থেকে শুরু হল পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিমী শোষণের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ। ছাত্রদের উৎসাহ ও চেষ্টায় মুস্লিম লীগকে হারিয়ে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করা হল। এরা দাবী জানাল যে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতেই হবে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা বলে মেনে নিতে হবে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীদের চক্রান্তে এই মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়া হল।

এদিকে নানারকম ঝগড়া-ঝাঁটির ফলে পাকিস্তানের শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। পশ্চিম পাকিস্তানের আয়ুব খাঁ ছিলেন তখনকার সমগ্র পাকিস্তানের সেনানায়ক। তিনি সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে পাকিস্তানে সামরিক শাসন-ব্যবস্থা চালু করলেন। পূর্ব পাকিস্তানে যাঁরা স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন তাঁদের গেপ্তার করে জেলে পুরে রাখা হল। মুজিবরকে নিয়ে আয়ুব খাঁ খুব মুস্কিলে পড়লেন। প্রথমে তাঁকে দেড় বছর বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়। তারপর নানারকম ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে তাকে জেলে রাখার চেষ্টা হয়। কিন্তু আদালত থেকে তিনি বারবার মুক্তি পান।

এইভাবেই পাঁচ-ছয় বছর কেটে গেল। কিন্তু এদিকে যতই আয়ুবশাহী অত্যাচার চলছিল ততই বাঙালীর মনে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছিল। মুজিবর কিন্তু এর মধ্যে দু-এক বছরের জন্য ছাড়া পেয়েছিলেন। ছাড়া পেলেই মুজিবর স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাতেন। কাজেই আয়ুবের বিষনজরে পড়ে মুজিবকে বারবার জেলে যেতে হল। শেষ পর্যন্ত আয়ুব তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারলেন না। তখন মুজিবের সঙ্গে আরও চৌত্রিশ জনকে জড়িয়ে এক ষড়যন্ত্রের মামলা সাজানো হল। এই মামলা "আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলা" নামে পরিচিত।

সরকার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হল যে আসামীরা সকলে একত্রিত হয়ে ভারতের সাহায্যে স্বাধীন হবার চেষ্টা করছিল।

এদিকে জনসাধারণ তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে শাসন-ব্যবস্থা ছেড়ে দেবার দাবী করলেন। এই আন্দোলন এত প্রচণ্ড হয়েছিল যে সাজানো "আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলা" তুলে নেওয়া হল। মুজিবর মুক্তি পেলেন। ঢাকার জনসাধারণ তাঁর মুক্তির আনন্দে তাঁকে এক অপূর্ব সংবর্ধনা জানালেন। লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষ এতে যোগদান করে। জনগণকে শান্ত করবার জন্য স্বয়ং আয়ুব তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং তাঁর ভাষণ বেতার থেকে প্রচার করবার ব্যবস্থা করে তাঁকে সম্মানিত করলেন।

আয়ুব কিন্তু ভাঙলেন তবু মচকালেন না। তিনি নিজে পদত্যাগ করে ইয়াহিয়া নামে আর একজন সেনানায়কের হাতে শাসনভার তুলে দিলেন। ইয়াহিয়া এক নতুন শাসন-ব্যবস্থা রচনা করবার জন্য অনেক দিন পর জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচন করবার ব্যবস্থা করলেন। নির্বাচন হয়ে গেলে দেখা গেল যে মুজিবের নেতৃত্বে তাঁর আওয়ামী লীগ সমস্ত পাকিস্তানের আইনসভায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের আইন-সভায় সব দলের চেয়ে বেশী আসন পেয়ে জয়লাভ করেছে।

তখন ইয়াহিয়া নতুন শাসন-ব্যবস্থা রচনার জন্য ঢাকাতে সমগ্র পাকিস্তানের আইনসভার অধিবেশনের জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু গোলমাল বাধালেন সিন্ধু প্রদেশের জুলফিকর আলি ভুট্টো। ইনি নির্বাচনের সময় শেখ মুজিবরের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী নেতা হয়েও ভুট্টো মুজিবরের কাছে হেরে গেলেন। হেরে গিয়েও তিনি বললেন যে তাঁর দলকে বাদ দিয়ে কোনও সরকার গঠন করা কিংবা সংবিধান রচনা করা চলবে না। তাছাড়া তিনি ঢাকাতে গিয়ে এই সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভুট্টোর পরামর্শে ইয়াহিয়া ঢাকায় আইন-সভা বাতিল করে দিলেন।

এই খবর বের হবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। মুজিবর বিরাট এক জনসভায় আরও তীব্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে বাঙালী অবাঙালী সকলকে হরতাল ও ধর্মঘট করতে আহ্বান জানালেন। সেই সভায় পূর্ব পাকিস্তানের নূতন নামকরণ করা হল "বাংলাদেশ"। "জয় বাংলা" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ভরে গেল। অবাঙালীরা কিন্তু এই আন্দোলনে যোগ দিল না। এর ফলে তাদের দোকানপাট তখন লুট হয়ে গেল। ইয়াহিয়ার আদেশে সৈন্যদল আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। তাদের গুলিতে এক রাতের মধ্যে হাজার হাজার নিরস্ত্র বাঙালীকে প্রাণ হারাতে হয়।



শেখ মুজিবর রহমান

এই ঘটনার দু'তিনদিন পর শেখ মুজিব ঢাকার এক বিরাট জনসভায় গান্ধীজীর মত দেশবাসীকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে ডাক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুজিবর আরও বললেন, "আমরা রক্ত দিয়েছি, আরও রক্ত দেব। এবারকার সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারকার সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

সমস্ত "বাংলাদেশে" মুজিবের আহ্বানে অপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল। সমস্ত অফিস, আদালত, কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। কোথাও কোনও সরকারী কাজকর্ম হল না। আরও কয়েকদিন পরে মুজিবর ঘোষণা করলেন যে দেশের শাসনভার তিনি নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন। ঢাকা বেতারকেন্দ্র থেকে দেশাত্মবোধক গান প্রচারের ব্যবস্থা হল।

এইসব ঘটনা ঘটে যাবার পর প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়ার টনক নড়ল। তিনি মুজিবের সঙ্গে আপোষ-আলোচনার জন্য ঢাকায় এসে উপস্থিত হলেন। মুজিব উত্তেজিত বাংলাদেশের মানুষদের জানিয়ে দিলেন যে ইয়াহিয়া অতিথি হিসাবে এসেছেন, কাজেই তাঁর যেন কোনও অসম্মান না হয়। কিছুদিন পরে ভুট্টোসাহেব এবং অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা ঢাকায় এসে উপস্থিত হলেন। দশদিন ধরে শেখ মুজিবের সঙ্গে এদের সকলের আলোচনা চলতে লাগল। কিন্তু মুজিব পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ছাড়া অন্য কোনও ব্যবস্থাই মেনে নিতে রাজী হলেন না।

আলোচনার শেষ দিন ছিল ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সাল। ইয়াহিয়া ও ভুট্টো সেই দিন রাত্রিতে কাউকে কিছু না বলে চোরের মত ঢাকা থেকে পালিয়ে গেলেন। রাত তখন বারটা; মানুষ যখন ঘুমে অচেতন, তখন ঢাকা শহরের রাস্তায় রাস্তায় কামান গর্জন করে উঠল। চারিদিকে আগুন আর আগুন, আর ঘুমন্ত স্ত্রী, পুরুষ, যুবক ও শিশুর করুণ আর্তনাদ। ইয়াহিয়ার 'বীর' পাঠান সৈনিকরা বাঙালীদের স্পর্ধা চিরদিনের মত খর্ব করবার জন্য রাস্তায় নেমে পড়ল। সেই রাতে বর্বর সৈন্যরা বাংলাদেশের শতসহস্র নিরস্ত্র অসহায় মানুষকে নিষ্ঠুর ভাবে মেরে ফেলল। একই সময়ে শেখ মুজিবকে বন্দী করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হল।

বাংলাদেশের বাঙালীরা এই অত্যাচার মাথা নীচু করে সহ্য করল না। তারা ইয়াহিয়ার লেলিয়ে দেওয়া সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য 'মুক্তিবাহিনী' নাম দিয়ে সৈন্যদল গঠন করল। পাঠান খানসৈন্যরা যাতে কোনও খাবার-দাবার না পায়, তারা যাতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাতায়াত না করতে পারে তার জন্য মুক্তিবাহিনী নানারকম বাধার সৃষ্টি করল। এতে পাঠান সৈন্যরা ক্ষেপে গিয়ে দোষী-নির্দোষ বিচার না করেই হাজার হাজার শিশু, স্ত্রীলোক ও পুরুষ হত্যা করতে লাগল। পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে এরকম পাইকারীভাবে গণহত্যা আর কোনও দিন কেউ দেখেনি।

এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বহু হিন্দু ও মুসলমান ভারতের মাটিতে পালিয়ে এল আশ্রয় নেবার জন্য। ভারতবাসীরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অসহায় মানুষদের ফিরিয়ে দিতে পারেনি। ভারত সরকার প্রায় এক কোটি বাংলাদেশের মানুষকে অনেকদিন পর্যন্ত খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করল। পৃথিবীতে যেখানে যে জাতি যখনই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে ভারতবাসীরা তখনই সেই মুক্তিকামী মানুষের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছে। এক্ষেত্রেও বাংলাদেশের মুক্তি-বাহিনীকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল ভারত সরকার। মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধবিদ্যার কৌশল শিক্ষা-দীক্ষা দেবার ও অস্ত্র-শস্ত্র জোগাবার ভার নিল ভারত সরকার। শুধু তাই নয়, আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাশিয়া, জার্মানী, ইংলণ্ড ও আমেরিকা গিয়ে তাদের সাহায্যে 'বাংলাদেশ' ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিবাদের যাতে মিটমাট করা যায় তারও চেষ্টা করেছিলেন। যখন আর কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে এল না তখন ভারত তার নিজের ঘাড়েই সব দায়িত্ব নিয়ে "বাংলাদেশের" স্বাধীন সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল।

এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করল। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ চলল প্রায় চৌদ্দ দিন ধরে। শেষে পরাজয় স্বীকার করে পাকিস্তানী সৈন্যরা পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যদের কাছে ও পূর্ব সীমান্তে মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। এইভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হল। নানাদেশের চাপে পড়ে শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল পশ্চিম পাকিস্তান সরকার। বন্দী অবস্থাতেই বাংলাদেশবাসী তাঁকে রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করেছিল। মুক্তি পেয়ে এখন তিনি স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন বাংলাদেশের একই আদর্শ। দুইটি দেশই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, ধর্মনিরপেক্ষ এবং জনগণের উন্নতিকামী। দুই বাংলার মানুষ আবার একে অপরের বন্ধু হয়েছে।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। বেদ ও মহাকাব্যের যুগে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল ?

২। বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে সিংহলের সঙ্গে বঙ্গদেশের যোগাযোগ সম্বন্ধে কি জানা যায় ?

৩। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ কালে ও গুপ্তযুগে বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কি জানা যায় ?

৪। শশাঙ্ক কে ছিলেন ? তিনি কেন দেবগুপ্তের সঙ্গে মিত্রতা করেন ? হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের যুদ্ধের ফল কি হয়েছিল ?

৫। দেবপালের সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা যা জান লেখ।

৬। পালযুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কি জান ?

৭। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান কে ছিলেন ? তাঁর সম্পর্কে কি জান ?

৮। প্রথম মহীপাল সম্পর্কে কি জান ?

৯। কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন ? তাঁর সম্পর্কে কি জান ?

১০। রামপালের সময় বাংলাদেশে সাহিত্য ও চিকিৎসাশাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল ?

১১। সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? তাঁর সম্বন্ধে কি জানা যায় ?

১২। বিজয়সেন ও বল্লালসেন সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

১৩। লক্ষ্মণসেনের সময় বাংলার কি অবস্থা ছিল ?

১৪। 'গীতগোবিন্দ' কে রচনা করেছিলেন ?

১৫। টীকা লেখ : গঙ্গারিডই, গঙ্গে, কর্ণসুবর্ণ, রাজ্যশ্রী, হর্ষবর্ধন, চক্রায়ুধ, নাগভট্ট, রাষ্ট্রকূট, ধ্রুব, দর্ভপাণি, কেদার মিশ্র, চর্যাপদ, হিউয়েন সাঙ, শীলভদ্র, বিক্রমশীল বিহার, চক্রপাণি দত্ত, রামচরিত, জয়দেব, হলায়ুধ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বঙ্গদেশে মুসলমানদের আগমন সম্বন্ধে কি জান ?

২। কে সর্বপ্রথম বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান হয়েছিলেন ? তাঁর বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন ? কিভাবে এই বংশের পতন হয়েছিল ?

৩। রাজা গণেশ সম্বন্ধে কি জান ?

৪। হোসেন শাহ ও নসরৎ শাহের রাজত্বের প্রধান প্রধান ঘটনা সম্বন্ধে কি জান ? তাঁদের সময়ে বাংলাদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল ?

৫। সুলতানী যুগে বাংলা সাহিত্যের কিরূপ উন্নতি হয়েছিল ?

৬। সুলতানী যুগে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক কিরূপ ছিল ? কেন হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পূর্ণ মিলন হতে পারেনি ?

৭। শ্রীচৈতন্যের ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে কি জান? তিনি শিষ্যদের কি উপদেশ দিতেন?

৮। বার ভুঁইয়াদের সম্পর্কে যা জান লেখ।

৯। টীকা লেখ : বখ্‌তায়ার খলজী, গিয়াসউদ্দীন আজম, জালালউদ্দীন মহম্মদ, কৃত্তিবাস ওঝা, মালাধর বসু, মনসামঙ্গল, পুরন্দর খাঁ, ঈশ্বরপুরী, এগার-সিন্ধু, কুলী খাঁ, মসনদ-ই-আলা।

তৃতীয় অধ্যায়

১। মুঘল যুগে বাংলাদেশে মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের উৎপাত সম্বন্ধে কি জান? মুঘলসম্রাটগণ এই উৎপাত বন্ধ করতে পেরেছিলেন কি?

২। মুর্শিদকুলী খাঁ সম্পর্কে কি জান?

৩। আলীবর্দী খাঁ কিভাবে বাংলার নবাব হয়েছিলেন?

৪। বর্গীর হাঙ্গামা বলতে কি বোঝ? এ হাঙ্গামার অবসান কিভাবে ঘটেছিল?

৫। ইউরোপীয় বণিকদের সম্বন্ধে কি জান? তারা কি উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিল?

৬। সিরাজউদ্দৌলা কে ছিলেন? তাঁর সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের সংঘর্ষের কারণ কি?

৭। বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত কেমন করে ঘটেছিল?

৮। মীরজাফর কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান?

৯। ক্লাইভের সঙ্গে মীরকাশিমের সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

১০। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে এবং কেন প্রবর্তিত করেছিলেন?

১১। টীকা লেখ : মহারাষ্ট্র পুরাণ, স্যার টমাস রো, জব চার্ণক, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

চতুর্থ অধ্যায়

১। উনিশ শতকের বাংলায় ইংরেজী শিক্ষার ফলে কি পরিবর্তন হয়েছিল?

২। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৩। টীকা লেখ : ব্রাহ্ম-সমাজ, শান্তিনিকেতন, বিধবা-বিবাহ, জাতীয় গৌরবসম্পাদনী সভা, যত মত তত পথ, বন্দেমাতরম্, আনন্দমঠ

পঞ্চম অধ্যায়

১। লর্ড কার্জন বঙ্গদেশ কেন ভাগ করেছিলেন ?

২। খণ্ডিত বঙ্গদেশ আবার জোড়া লাগল কিভাবে ?

৩। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কি অংশ গ্রহণ করেছিলেন ? তাঁর জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। বিপিনচন্দ্র পাল এই সময় কিভাবে লোকের মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিলেন ?

৫। স্বাধীনতা সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের অবদান সম্বন্ধে কি জান ?

৬। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ও পরবর্তী কালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দেশের জন্য কি করেছিলেন ?

৭। টীকা লেখ : আনন্দমোহন বসু, বয়কট, রাষ্ট্রগুরু, গুরুদেব, দিব্য-জীবন, স্বরাজ্যদল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। বঙ্গদেশে বিপ্লব আন্দোলন বলতে কি বোঝায় ?

২। বিপ্লবীদের কি উদ্দেশ্য ছিল ?

৩। ক্ষুদিরামের ফাঁসি কেন হল ?

৪। যতীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী বসু ও মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৫। বিনয়-বাদল-দীনেশ কিভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন ?

৬। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে যা জান লেখ।

৭। নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ্ ফৌজ সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

৮। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে মাতঙ্গিনী হাজরা কি করেছিলেন ?

। টীকা লেখ : বাঘা যতীন, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, কদম কদম বঢ়ায়ে যা।

সপ্তম অধ্যায়

১। স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে কি জান লেখ। তিনি ভারতবাসীদের কি উপদেশ দিতেন ?

২। নিবেদিতা কে ছিলেন ? ভারতে এসে তিনি কি কাজ করেছিলেন ?

৩। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কি জান লেখ ? তিনি কোন বইয়ের জন্য নোবেল পুরস্কার পান ? স্বাধীন ভারতের জাতীয় সঙ্গীত কি ?

৪। বাঙালীদের জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কি করেছিলেন ?

৫। জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান গবেষণায় কি কাজ করেছিলেন ?

৬। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙালীর অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কি কাজ করেছিলেন ?

৭। অশ্বিনীকুমার দত্ত কে ছিলেন ? কেন লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা করত ?

৮। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সুভাষচন্দ্র বসুর দান সম্পর্কে কি জান লেখ।

৯। কাজী নজরুল ইসলাম কিভাবে বাঙালীদের মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেছিলেন ?

১০। ফজলুল হককে কেন শের-ই-বঙ্গাল উপাধি দেওয়া হয়েছিল ? দুই বাংলার অধিবাসীদের সম্বন্ধে তিনি কি মতামত প্রকাশ করেছিলেন ?

১১। বিধানচন্দ্র রায় কিভাবে বাঙালী জাতির উন্নতিবিধানের জন্য চেষ্টা করেছিলেন ?

১১। টীকা লেখ : বেলুড়মঠ, জনগণমন-অধিনায়ক, বিশ্বভারতী, বাংলার বাঘ, বরিশালের মুকুটহীন রাজা, ফরওয়ার্ড ব্লক, বিদ্রোহী কবি, শের-ই-বঙ্গাল।

অষ্টম অধ্যায়

১। কেন দ্বিতীয় বার বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল ?

২। দেশবিভাগে কংগ্রেস ও মুশ্লিম লীগ কি অংশ গ্রহণ করে ?

৩। বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে র‍্যাডক্লিফের রায় হিন্দু ও মুসলমানরা কিভাবে গ্রহণ করে ?

৪। কোন কোন বিভাগ বা জেলার অংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল ?

নবম অধ্যায়

১। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা কিভাবে পাকিস্তানের শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল ?

২। শেখ মুজিবর রহমান কিভাবে নেতা হন ?

৩। পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে কি জান ?

৪। বাংলাদেশের সৃষ্টি কিভাবে হল ? মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কিরূপ ?

৭। বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনে ভারত কিভাবে সাহায্য করেছিল ?

৮। টীকা লেখ : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, শহীদ দিবস, জয় বাংলা, মুক্তিবাহিনী, আওয়ামী লীগ।

Raichaudhuri: History of Bengal for Class VI, Bengali.

Rs 4